Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা

গবেষক :

মশিউর রহমান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত

অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগের এম. ফিল. গবেষক মশিউর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ‘‘আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা (The Drama of Abdullah Al-Mamun : The Spirit of Liberation War)” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেনি। আমি মনে করি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। মশিউর রহমানকে অভিসন্দর্ভটি জমাদানের জন্য অনুমোদন দেওয়া হল।

ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি.

ফাতেমা কাওসার ৫/১২/২০২১

(অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

সমাজবদলের প্রত্যয়ে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বেগবান হয় মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে। সমাজবদলের প্রয়াসে এ সময়ের আধিকাংশ নাট্যকারই কোনো না কোনো নাট্যদলের সদস্য এবং দলের প্রয়োজনেই তাঁরা নাটক রচনা করেছেন, পরিচিতিও পেয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে। বিষয়বৈচিত্র্য, নির্মাণশৈলী, জীবনদৃষ্টি ও ভাষা প্রয়োগে তাঁরা সকলেই স্বাতন্ত্রের দাবিদার। সমসাময়িক যুগের নাট্যকার হয়েও আবদুল্লাহ আল-মামুন সমকালকে অতিক্রম করেছেন। তিনি শক্তিশালী নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, নাট্য নির্দেশক, নাট্য প্রযোজন, নাট্য প্রশিক্ষক ও নাট্যদল সংগঠক। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তাঁর নাটকগুলোতে। তাঁর নাটকে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ অসাধারণ। অসাম্প্রদায়িকতা, দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটককে বিশিষ্টতা দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতার শত্রুরা নতুন পরিচয়ে নতুন ভাবে স্বাধীনতার স্বপ্নকে মুছে দিতে উদ্যত ঠিক তখনই আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্রদের। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক রচনা করে, বাংলা নাট্য সাহিত্যে, অমূল্য অবদান রেখেছেন। ''আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা'' আমার এম. ফিল. গবেষণার বিষয়।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা নাটকের উদ্ভব এবং তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। বাংলা নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা নাটকে ভিনদেশি নাট্যকার ও নাটকের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মঞ্চনাটক, টিভি নটিক, অনুবাদ নাটক ও মৌলিক নাটকের ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে। '৪৭ পূর্ববর্তী বাংলা নাটকের প্রভাব '৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে কীভাবে পরেছে সে সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বাংলাদেশের নাটকে কীভাবে স্থান করে নিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নাটকের ওপর বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে বাংলা ও বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ও মানস-দৃষ্টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাঁর জন্ম, শিক্ষাজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা, জীবনদর্শন, নাট্যভাবনা সম্পর্কে ধারনা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন নাট্যকার, বিশিষ্টজন, সহকর্মী, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ও অনুসারিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনা নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সে বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর রচিত, অভিনীত, পরিচালিত নাটক সমূহের তালিকা, স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা আলোচ্য অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজতথা রাষ্ট্রের একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল; তার প্রতিফলন যে সমস্ত নাটকে স্থান পেয়েছে সে সব নাটক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে অতি দ্রুত আমাদের সমাজ থেকে সুবচন, শুভবুদ্ধি কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সেসব বিষয় নিয়ে শিল্পিত হয়েছে, *সুবচন নির্বাসনে* নাটক। *তোমরাই*, *এবার ধরাদাও* এবং *আয়নায় বন্ধুরমুখ* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে যুবসমাজের হতাশা, বিপথগামিতা এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তরুণ সমাজের যে অবক্ষয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটকে। *এখন ও ক্রীতদাস* নাটকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। নাগরিক জীবনের আভিজাত্যের পাশাপাশি বস্তিজীবনের দুর্বিষহ বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে এ নাটকে। আমাদের সমাজকে কেউ না কেউ ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। এই নাটকে ক্রীতদাস বানানো শোষকশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। *আয়নায় বন্ধুরমুখ* নাটকে রানার স্বীকারোক্তিতে পাপের পথ থেকে সুন্দর জীবনে ফিরে আসার ইঙ্গিত প্রকাশের মাধ্যমে, স্বাধীনতা উত্তরকালে যুবসমাজের হতাশা, বিপথগামীতা, আত্মসমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে। *এবার ধরা দাও* নাটকে করজোড়ে আত্মগ্লানি, পরিশুদ্ধির বোধ থেকে তরুণকে বলতে শুনি আমি ভালো থাকতে চাই। আপনারা আমাকে বাঁচান। আপনাদের একটা জেনারেশন কে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচান। আপনারা আমাকে একটি সৎ পরামর্শ দিন। *এখন দুঃসময়* নাটকে সোনাচরিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ পরবর্তী মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া বেপারি ও টাউট মুন্সীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তালুকদার রূপি ছদ্মবেশি চরিত্রের কারণে দেশের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তাই এদের প্রতিহত করার আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে *সেনাপতি* নাটকে। *তোমরাই* নাটকে রাজাকার হায়দার আলী মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, নতুন প্রজন্ম তাদের কথা মতো চলবে কিন্তু নাটকের শেষে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের রঞ্জু বিপথগামী হলেও অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের শেষাংশে স্বাধীনতার শত্রু হাজী মেহেরজানের হাতে থাকা স্টেনগানের গুলিতে মারা যায়। যে পিতা জাতির মুক্তি এনে দিয়েছে তাকেও হত্যা করতে পরোয়া করেনি এদেশের জঘন্য সন্তানেরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশকে অস্থির করে স্বাধীনতা শত্রুদের রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ ছিল দিবালোকের মতো সত্য। নাট্যকার এসব স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের ধিক্কার জানিয়েছেন *মাইক মাস্টার* নাটকে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে রাজাকার-আলবদর বাহিনীর মতো জঘন্য ঘৃণ্য সদস্যদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু সুবিধাবাদি, *বিবিসাব* নাটকের মুক্তিযোদ্ধা মেম্বার যিনি হাত মিলিয়েছেন '৭১ এর রাজাকার বসিরুদ্দিন মোল্লার সাথে। স্বাধীনতার শত্রু আলী ইমামের স্বীকারোক্তি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জাফরের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি, এদেশ জাফরের ইমামের নয় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে, মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের সাথে একই ছাতার নিচে দাড়াতে লজ্জা পায়নি ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা। এরকম বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে *দ্যাশের মানুষ*। নাটকের শেষে আর.কে. চরিত্রকে হত্যার মাধ্যমে নাট্যকার স্বাধীনদেশে স্বাধীনতার পক্ষের জয় দেখাতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নতুন প্রজন্মকে বিপথগামী করতে স্বাধীনতার শত্রুরা নানাকূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে এদেরকে রক্ষার জন্য যে'কজন নাট্যকার হাতে কলম তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন।

উপসংহারে গবেষণার সারসংক্ষেপ ও গবেষকের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে মূলগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থাবলি ও পত্রপত্রিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনদেশে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিরোধীরা সফল হলেও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে মুক্তিযোদ্ধাদের জয় দেখাতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাইতো তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক সমূহ হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত। আমরা খুঁজে পেয়েছি একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

‘আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসারের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ রূপে রচিত। তাঁর সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

গবেষণাকালীন সময় আমার অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কালে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে আজমীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

মশিউর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ও মানস-দৃষ্টি ৪৭

জন্ম পরিচয়, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত জীবন ৪৮

কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন ৫১

নাট্যরচনা, অভিনয় ও নির্দেশনা ৫৯

যাত্রা ও চলচ্চিত্র শিল্প ৭৫

সংলাপ নির্মাণ ও শিল্পী তৈরির দক্ষতা ৭৮

প্রতিনিধিত্ব, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ৮১

মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ৮৪

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ৮৯

উপসংহার ১৫১

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা (The Drama of Abdullah Al-Mamun : The Spirit of Liberation War)" আমার এম. ফিল. গবেষণার বিষয়বস্তু। গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার।

আবদুল্লাহ আল-মামুন শক্তিশালী নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, নাট্য নির্দেশক, নাট্য প্রযোজন, নাট্য প্রশিক্ষক ও নাট্যদল সংগঠক। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তাঁর নাটকগুলোতে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক রচনা করে তিনি বাংলা নাট্য সাহিত্যে, অমূল্য অবদান রেখেছেন। অসাম্প্রদায়িকতা, দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর নাটককে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ষাটের দশকের মধ্যলগ্নে বাংলা নাট্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে চার দশকের নিরন্তর সাধনায় তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন একটি স্বকীয় শিল্পভুবন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কলম ধরেছিলেন সাহসী এই নাট্যকার। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার শত্রুরা যখন নতুন পরিচয়ে নতুন ভাবে স্বাধীনতার চেতনাকে মুছে দিতে উদ্যত ঠিক তখনই আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ জনগণ, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্রদের।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা নাটকের উদ্ভব এবং তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। বাংলা নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা নাটকে ভিনদেশি নাট্যকার ও নাটকের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মঞ্চনাটক, টিভি নটিক, অনুবাদ নাটক ও মৌলিক নাটকের ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে। '৪৭ পূর্ববর্তী বাংলা নাটক '৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের নাটককে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বাংলাদেশের নাটকে কীভাবে স্থান করে নিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাটকের ওপর বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে বাংলা ও বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ও মানস দৃষ্টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাঁর জন্ম, শিক্ষাজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা, জীবনদর্শন, নাট্যভাবনা সম্পর্কে ধারনা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন নাট্যকার, বিশিষ্টজন, সহকর্মী, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ও অনুসারিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনা নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে কীভাবে চালিত করেছিল সে বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর রচিত, অভিনীত, পরিচালিত নাটক সমূহের তালিকা, স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা আলোচ্য অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে; তার প্রতিফলন যে সমস্ত নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে সে সব নাটক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপসংহারে গবেষকের নিজস্ব মতামত ও গবেষণার সারসংক্ষেপ আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে সহায়ক গ্রন্থাবলি ও পত্রপত্রিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। নাটক সেকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হতো না, নাটক অভিনীত হতো। নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালের দর্শকসমাজ। সমাজের নানান বিষয় নাট্যকার দর্শকের সামনে তুলে ধরেন বলে নাটককে সমাজ জীবনের দর্পণ বলা হয়। নাটক শব্দটির মধ্যেই নাটক কী, তার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটক, নাট্য, নট, নটী এই শব্দগুলোর মূল শব্দ 'নট্'। নট্ মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Drama। Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোনো কিছু করা। নাটকের মাধ্যমে আমরা মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ইত্যাদির বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। *Online free dictionary* তে নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-'A prose or verse composition, especially one telling a serious story, that is intended for representation by actors impersonating the characters and performing the dialogue and action.' এলারডাইস নিকলের মতে, 'Drama is the art of expressing ideas about life in such a manner as to render that expression capable of interpretation by actors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the actions.'[১]

সাহিত্যের প্রাচীন রূপটিকে বলা হতো কাব্য । কাব্য ছিল দুই প্রকার শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। সাহিত্য প্রধানত পাঠ করে শোনানো হতো। আর যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হতো, সেগুলো ছিল দৃশ্য কাব্য। এজন্য সংস্কৃতে নাটককে বলা

[১] রাজীব হুমায়ুন, *নাটক রচনা : রূপ ও রীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটককে শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না, এতে শোনারও বিষয় থাকে। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা এবং সংলাপ শোনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' নাটক পাঠ করা যেতে পারে; মঞ্চে, টিভি-রেডিও বা অন্য গণমাধ্যমে অভিনীত হতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম। সাহিত্যের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে নাটকের একটা বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম আছে। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রভৃতিতে লেখক যে শিল্পরীতির অনুসরণ করেন, নাটকের শিল্পরীতি তা থেকে পৃথক। সমালোচকের মতে-

> নাটকের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, পরিবেশ নির্দিষ্ট, অভিব্যক্তির ধারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটা চলমান ঘটনাকে অবলম্বন করে নর-নারীর ভাষণ ও কার্য দ্বারা যে রূপটি ফুটে ওঠে, তাই নাটকের নির্দিষ্ট রূপ। নাটকে নাট্যকারের কোনো স্থান নাই-কোনো বিশ্লেষণ, মন্তব্য বা অসংবদ্ধ কল্পনাবিলাসের অবসর সেখানে নাই। নাট্যকারের স্থান নাটকের নেপথ্যে।[২]

গ্রীস, ভারতবর্ষ ও রোমের নাট্য-ঐতিহ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এদের নাট্যমঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নাটকের উদ্ভবের মূলে প্রায় সব দেশেই রয়েছে ধর্মের প্রভাব। প্রাচীন গ্রীক নাটকের মূলেও ছিল ধর্মের প্রভাব। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক পুরাণের আখ্যান। দেবদেবীর মন্দিরে নাটকের অভিনয় ধর্ম-উৎসবের অংশ বলে পরিগণিত হতো। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে নাটক অভিনীত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়ও দেখা গেছে, চর্যাপদ নৃত্য ও অভিনয়সহ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিবেশিত হতো। এ থেকে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের। আমাদের যাত্রাপালার ঐতিহ্যও বেশ পুরনো। প্রাচীন যাত্রা, নাটগীত অথবা পাঁচালী গান অবলম্বন করে আমাদের দেশে বিবর্তনের ধারায় নাটক ও রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেনি। ''কলকাতায় সর্বপ্রথম যে থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় তা ইংরেজী নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য।''[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

[২] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ১

[৩] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

শেষভাগে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭), প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটার নাট্যধারার দায়িত্ব নিতে পারেনি, কারণ দেশের লোকের রুচি ও উদ্যামের সঙ্গে এর কোন সংযোগ ছিল না। ''বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এর বিকাশ সাধিত হয়েছে উনিশ ও বিশ শতাব্দীব্যাপী।''[৪]

১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার পর যে নাটকাভিনয়ের ধারা শুরু হয় তা দেখে ধনী, সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যানুরাগীর দল সন্তুষ্ট হন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজারের অংশবিশেষ ও ইউলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির উত্তররামচরিত অভিনয় হয়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে -সাঁসুসি নাট্যশালায় ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৮৫২-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এই কয় বৎসরে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়েছিল। তারাচরণ শিকদার ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে *ভদ্রার্জুন* নামে একটি মৌলিক নাটক লিখেন, কিন্তু ইহা অভিনীত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। সুভদ্রা হরনের কাহিনী নিয়ে এটা রচিত। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে জি. সি. গুপ্তের বিয়োগান্ত নাটক *কীর্তিবিলাস* রচিত হয়। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় হরচন্দ্র ঘোষের *ভানুমতী চিত্তবিলাস Merchant of Venice* অবলম্বনে। ১৮৫৮ সালে নবীন ও প্রাচীন সমাজের উল্লাসহেতু রচনা করেছিলেন *কৌরব বিয়োগ*। রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে *চারুমুখ চিত্তহরা* (১৮৬৪) ও ব্রহ্মদেশীয় মনোহর কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন *রজতগিরি নন্দিনী* (১৮৭৪)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩-১৮৮৫) প্রথম নাট্যকার যিনি নাটকের বিষয় সমসাময়িক সমাজ-জীবন হতে গ্রহণ করে একে বাস্তব ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দান করেন। *কুলীনকুল সর্বস্ব* (১৮৫৪) দ্বারা রামনারায়নের সত্যিকারের খ্যাতি। তাঁর আরও তিনটি মৌলিক নাটক হচ্ছে *নবনাটক, রুক্মিণী হরণ* (১৮৭১), *কংশবধ* (১৮৭৫)। চারটি সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *বেনীসংহার* (১৮৫৬), *অভিজ্ঞান শকুন্তলা* (১৮৬০), *মালতী মাধব* (১৮৬৭) অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বাংলা নাটকের

[৪] মাহবুব সাদিক, 'নাটক', *ভাষা ও সাহিত্য* (সম্পাদক : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তাঁর *কুলীনকুলসর্বস্ব* নাটক তৎকালীন নাট্যসাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সমকালীন সমাজব্যবস্থার কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকগুলো নাটকে রূপায়িত করতে গিয়ে গঠনগত দিক থেকে তাঁর চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিষয়বস্তু গুণে শুধু তিনি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা নয়, বরং তাঁর অনুগামি একটা নাট্যধারার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। তাঁর নাটকের অভিনয় সাফল্যের পর থেকেই অভিনয় শিল্পে এবং বাংলা নাটক রচনায় প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন অজস্র নাটক রচিত হয়েছে, অন্যদিকে অভিনয়যোগ্য নাটকের প্রয়োজন প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাব আকস্মিক এবং প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নয় নাট্যকাররূপে। কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবালী* নাটকের অভিনয়ের সংস্পর্শে এসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের দান সম্পর্কে বলা যায় যে, মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলা নাটককে মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন অর্থাৎ অভিনয় ও মঞ্চ সজ্জার মধ্যে নাটককে দৃশ্যমান করলেন। মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপখ্যান অবলম্বনে রচিত। *শর্মিষ্ঠা'র* পরে মধুসূদন *পদ্মাবতী* (১৮৬০) রচনা করেন। গ্রীক পুরানের কাহিনী নাটকটির ভিত্তিভূমি। *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। প্রাচ্য নাট্যরীতি অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্য অলংকারের নির্দেশ অনুসরণে তিনি *কৃষ্ণকুমারী* কে বিয়োগান্ত করেন। *মায়াকানন* (১৮৭৪) কিছুটা দুর্বল নাটক। *কৃষ্ণকুমারী'*র পূর্বে যে দুটি বিয়োগান্ত নাটকের সন্ধান আমরা পাই সেগুলো সার্থক ট্র্যাজেডি নয়। প্রহসন রচনায়ও মধুসূদন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাট্যরচনার কাল মাত্র দু বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। তাঁর নাট্যরচনা দ্বন্দ্বসংঘাতের ফলে নাট্যরসে ঘনীভূত হয়েছে, নাটকীয় রসপুষ্টির জন্য ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্রসৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালির প্রাণধর্ম ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবননিষ্ঠতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মধুসূদনের নাটকে একদিকে যেমন মানবজীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানবমনের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। মধুসূদনের হাতেই বাংলা নাটকের ভাষা, কাহিনি, চরিত্রসৃষ্টি আদর্শ রূপ লাভ করেছে। সেই সাথে সার্থক বাংলা নাটকের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আমরা অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) পূর্বেই সমাজ সচেতন নাটকের পরিচয় পেয়েছি। সমাজ-সচেতনতায় দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিশিষ্টতা রয়েছে। তাঁর রচিত *নীলদর্পণ* (১৮৬০) সংস্কারমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক নাটক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ নাটকের মধ্যে সহজ ও সরল গ্রাম্য মানুষের যে পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাট্য সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন। নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশব্যাপী প্রবল চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় এবং ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশের জন্য জেমস লং রাজরোষে পতিত হন। *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩), *লীলাবতী* (১৮৬৭) এবং *কমলে কামিনী* (১৮৬৩) দীনবন্ধু মিত্রের অন্য তিনটি জটিল জীবন সংঘাতের নাটক। *সধবার একাদশী* (১৮৬১) *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *জামাই বারিক* (১৮৭২) এর মতো হাস্যরসাত্মক সমাজ সচেতন মূলক প্রহসন লিখেছেন। ''দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক রীতিনীতির একজন সূক্ষ্ম দর্শক ছিলেন। পরিচিত পৃথিবীর যে সমস্ত ঘটনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং তার মধ্যে যে বিকৃতি ও অশোভনতা ছিল, সেগুলিকে তিনি কৌতুকপূর্ণরূপে তাঁর নাটকে বর্ণনা করেছেন।''[৫]

তাঁর নাটকের যথেষ্ট অভিনয়োপযোগিতা থাকায় সাধারণ নাট্যশালায় সেগুলো অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তৎকালীন জনসমাজে প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনা বেশি সমাদৃত হতো। দীনবন্ধু মিত্রের এই শ্রেণির রচনায় কৌতুকরসের প্রাধান্য ছিল বলে তা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-অনাচার প্রভৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি হাস্যরসের অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি চরিত্রের মধ্যে একটা স্বাভাবিকতাও রয়েছে। তিনি ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। এই সমস্ত

[৫] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটক রচনার মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

উনিশ শতকের হিন্দুদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। তাঁর নাট্যসৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য দুর্লভ আঙ্গিক-চেতনা, তথা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন প্লট ও সংলাপের রচনায়। তাঁর শিল্প মননের মূলে একটি আভিজাত্য ছিল, সে কেবল ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রার ফল নয়, শিল্পীর ফরাসি সাহিত্যচর্চার দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর অনুবাদ নাটকের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। তাঁর প্রথম এবং প্রধান ঐতিহাসিক নাটক *পুরুবিক্রম* (১৮৬৪)। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে *সরোজিনী* (১৮৭৫), *অশ্রুমতি* (১৮৭৯) এবং *স্বপ্নময়ী* (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। তিনি ঘটনা সজ্জায় যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রয়োজন মতো ইতিহাসের ঘটনা পরিবর্তন করে নাটককে করেছেন জীবন্ত ।

মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান এবং প্রতিষ্ঠিত গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। তাঁর সর্বপ্রথম নাটক *বসন্তকুমারী* ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। *বসন্তকুমারী* নাটকে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের *কীর্তিবিলাস* নাটকের ছাপ আছে।কিন্তু *কীর্তিবিলাসে'র* তুলনায় *বসন্তকুমারী* নাটক অনেক বেশি সংহত। তাঁর দ্বিতীয় নাটক *জমিদার দর্পণ* ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর তেরো বৎসর পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নিজের জীবনের সহজ সরল বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নাটক-প্রহসনে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। তিনি নাটকে অন্যায়-অনাচার রূপায়ণে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রসৃষ্টিতে মীর মশাররফ হোসেন পূর্বসূরীর অনুসারী হলেও তাঁর কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে সমধিক। নাটকে ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি এবং সঙ্গীত সংযোজনা তাঁর নিজস্ব শিল্পকুশলী মনের পরিচয় বহন করে।

বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আইনগত কোনও প্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে অজস্র বাংলা নাটক রচিত হয়েছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

অভিনীত হয়েছে। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নাটক এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি বাধার সৃষ্টি হয়। "১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে 'ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস কনট্রোল বিল' নামক একটি আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং বছরের শেষের দিকে তা আইনে পরিণত হয়।"[৬] এই আইন প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার স্বাধীন অভিব্যক্তির যুগ শেষ হয়, নাটকের গতিতে কিছুটা মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারদের স্বাধীনভাবে নাটক রচনার পথ বাধাগ্রস্থ হয়।

আরব্য-উপন্যাসের রোমাঞ্চকর এবং রহস্য-প্রগাঢ় কাহিনি অবলম্বন করে ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৪-১৯৩৭) যে সমস্ত নাটক রচনা করেছিলেন আনন্দ উপভোগের বিবেচনায় তা আজও আমাদের নিকট আনন্দদায়ক। গীতিনাট্য রচয়িতা হিসেবেই তাঁর দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি। এক সময় নৃত্যগীতের সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে দর্শককে এ গীতিনাট্যগুলি অবিরাম আনন্দ দিয়েছে এবং বর্তমানকালেও এদের প্রসাদগুণ নষ্ট হয়নি। *আলিবাবা* (১৮৯৭) একটি সর্বসময়ের জন্য সমাদৃ ত গীতিনাট্য। রহস্য, রঙ্গকৌতুক, রোমান্স এবং তাদের নিশ্চিত প্রবাহ নাটকটিকে চিত্তগ্রাহী ও আনন্দময় করেছে। *বেদৌরা* (১৯০৩) নাটকে আরব্য-উপন্যাসের অন্য একটি উপাখ্যান নাট্যরূপ পেয়েছে। আরব-ইরান-তুর্কীর কয়েকটি কাহিনী নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ *জুলিয়া* (১৮৯৯) *সপ্তম-প্রতিমা* (১৯০২), *দৌলতে দুনিয়া* (১৯০৮), *পলিন* (১৯১১), *মিডিয়া* (১৯১২), *রূপের ডালি* (১৯১৪), *বাদশাজাদী* (১৯১৬) ইত্যাদি কয়েকটি উপভোগ্য নাটক রচনা করেন। যুগের রীতি অনুসারে ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটিও হৃদয়গ্রাহী হয়নি। নাটকগুলির নাম *বভ্রু বাহন* (১৮৯৯), *সাবিত্রী* (১৯০২), *উলুপী* (১৯১৬), *ভীষ্ম* (১৯১৩), *মন্দাকিনী* (১৯২১) ও *নবনারায়ণ* (১৯২৬)। তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে রঙ্গনাট্য, কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য রচনায়। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম । ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিত্বে কবি জনোচিত উচ্ছ্বাস কম ছিল বলে নাট্যরচনায় তাঁর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারেনি। তাঁর স্বাদেশিকতা বা

[৬] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পৌরাণিকতা প্রবুদ্ধ নাটকে বিয়ষবস্তু প্রায়ই শিথিলবদ্ধ হয়েছে, সংলাপও হয়েছে কৃত্রিম।

অভিনয় দক্ষতা এবং কুশলী পরিচালনা ক্ষমতার জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২) সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রভাবশালী এবং খ্যাতিমান নাট্যকার । ধর্ম, সমাজ, সংসার এবং রাজনীতি সমস্ত কিছুই তাঁর নাটকের উপজীব্য ছিল। তিনি যে শুধু নাটক রচনা করেছেন তাই নয়, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করেছেন এবং অভিনয় শিল্পের প্রবর্তন করেছেন। তাকে জাতীয় রঙ্গালয়ের পিতা বলা হয়। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর সমস্যা নিয়ে তিনি অনেকগুলো সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটক *প্রফুল্ল* (১৮৮৯)। এক সময় নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সম্বর্ধনা পেয়েছে। তাঁর অন্যান্য সামাজিক নাটকের মধ্যে *মায়াবসান* (১৮৯৮), *বলিদান* (১৯০৫), *গৃহলক্ষ্মী* (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য এবং জাতীয়তাবোধ গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের প্রধান নাটকগুলো হল *সিরাজদ্দৌলা*, *মীরকাসিম* ও *ছত্রপতি শিবাজী*। *সিরাজদ্দৌলা* প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তির পর থেকে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁর শোচনীয় পরিণতির পর মীর জাফরের মসনদ লাভে নাটকের সমাপ্তি। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটক রচনায় সাহিত্যের প্রয়োজনের চেয়ে মঞ্চের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই শেষ বয়সে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'একখানি নাটকও তিনি নিজের ইচ্ছামত লিখে যেতে পারেননি।' এই আক্ষেপে নটের কাছে নাট্যকারের পরাভবই ব্যক্ত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রথমে নট ও মঞ্চাধ্যক্ষ, পরে নাট্যকার। তিনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ধর্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর নাট্যরচনার পশ্চাতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সমাজসচেনতা। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল বলে নাট্যরচনায় তিনি বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। বিশেষ কোন মঞ্চ চরিত্রের উপযোগী করে নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া, বাঙালি মানসের ধর্মভীরুতা, জীবনে নীতি আদর্শের প্রভাব, মহাপুরুষ চরিত প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

অবলম্বনে রচিত নাটকের জন্য তিনি দর্শকদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তাঁর নাটকে আবেগই প্রাধান্য লাভ করেছে, জীবনের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর নাট্যরচনায় উচ্চশ্রেণির সাহিত্য শিল্পেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গিরিশ ঘোষ আন্তরিকতা সহকারে সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ভাষারীতি অবলম্বনে বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের সেবা করে গেছেন। কোনো কোনো নাটকে তাঁর নিজের প্রবর্তিত গৈরিশ ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। এতে তিনি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেন। তাঁর নাটকে দেশীয় ও জাতীয় ভাবই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তবে বিদেশি ভাব ও সাহিত্যাদর্শ তিনি অস্বীকার করেননি। নাট্যকারের পাশাপাশি তিনি অনেক পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) খ্যাতিমান নাট্যকার। মঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। বিষয়বস্তু এবং আবেগের দিক থেকে অমৃতলালের নাটক ছিল গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিপরীত। গিরিশচন্দ্র যেখানে তত্ত্বসন্ধান করেছেন, অমৃতলাল সেখানে পরিহাসের কোলাহল তুলেছেন। তাঁর রচিত নাটক *হীরক চূর্ণ* (১৮৭৫), *সাবাস বাঙালী* (১৯০৬)। অমৃতলাল বসু গীতিনাট্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকে জীবনের গভীরতর রূপের পরিচয় নেই। কৌতুক সৃষ্টি ও হাস্যরস পরিবেশনের প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন, ফলে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর নাটকে গানের বাহুল্য ছিল। তিনি গান ও ছড়া রচনার সরসতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর গদ্য কথোপকথন আধুনিক ও ঘরোয়া বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তিনি রসরাজ নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নট ও নাট্যকারের উভয় ভূমিকাতে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটতে থাকে। সে পরিচয়ের প্রথম সূত্রে সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং তা অভিনীত হয়। এই সময়ে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ চলছিল, কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের চিন্তায় নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) সেক্সপীয়রের *মার্চেন্ট অব ভেনিস*

Dhaka University Institutional Repository

এর বাংলা অনুবাদ *ভানুমতি চিত্ত-বিলাস* নামে প্রকাশিত করেন। *রোমিও জুলিএটের* অনুবাদ করেছিলেন *চারু-মুখ চিত্তহরা* নামে। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। অনুবাদ নাটকের প্রভাবে বাংলা নাটকের গতি প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা নাটকে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে সার্থকতা লাভ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক নাটকের বন্যা প্রবাহিত করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর পূর্বে পৌরাণিক নাটকের বন্যাবেগ দেশকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, বিচ্ছিন্নভাবে একটি দুটি ঐতিহাসিক নাটকের সন্ধান পাওয়া গেলেও দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব পর্যন্ত তা বলিষ্ঠ ধারা নির্ধারণ করেনি। *তারাবাঈ* (১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। *দুর্গাদাস* (১৯০৬) নাটকে কয়েকটি মুসলমান চরিত্র শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এই নাটকেই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিমূলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। নাটকের একটি চরিত্র দিলির খাঁ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা অনেকবার বলেছেন। *নূরজাহান* (১৯০৮) নাটকটি ট্রাজেডি। ইতিহাস এখানে প্রেমের উৎসভূমি হয়েছে, স্বাদেশিকতার নয়। এই প্রেমকে মমতা, করুণা বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাগ্রত করেছেন। *মেবার পতন* (১৮০৮) একটি নীতিমূলক ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকারের ভাষায় সেই নীতি হল বিশ্বপ্রেম। মঞ্চের সাফল্যের দিক থেকে *সাজাহান* (১৯০৯) নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং পরিহাস-নাটক এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি আখ্যানবস্তু গঠনে যেমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তেমনি দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র গঠনে ও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। মানবমনের স্পৃহার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার যে দ্বন্দ্ব এবং হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব তার পরিচয় তাঁর অধিকাংশ নাটকেই আছে। তিনি নাটকের মধ্যে শক্তিশালী, কবিত্বপূর্ণ ও নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করে নাটকের উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন। সুললিত শব্দ, পরিপাট্য সুষম ছন্দমাধুর্য তাঁর ভাষার গুণ। তবে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অনুসৃত ভাষারীতিতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে। বিভিন্ন শ্রেণির পাত্রপাত্রীর ভাষা একই ধরনের হওয়াতে তাঁর নাটকে অপকর্ষ বিদ্যমান।

নাটক রচনায় পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। নাটকের বিষয়, কলাকৌশল প্রয়োগে তিনি নতুনত্ব দেখিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি রবীন্দ্রমানসে অভিঘাতের সৃষ্টি করে, তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের দ্বারা নাটককে পরিচালিত করায় নাট্যসৃষ্টিতে তাঁর বস্তুধর্মিতার চেয়ে রোমান্টিক আদর্শের অনুসৃতি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে বেশি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্বের সাহচর্য, বিলেতের নাট্য ও সংগীত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এবং ব্যাপক পঠন পাঠনের দ্বারা স্বতন্ত্র ধারার নাটক রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সমালোচকের মতে :

> রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারাকে গ্রহণ না করলেও বাঙালি ঐতিহ্য ও ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের নাট্যভাবনাকে সাঙ্গীকৃত করে নাটক রচনা করেছেন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *আত্মপরিচয়* গ্রন্থে লিখেছেন, 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবিমাত্র'। আবার '*ছিন্নপত্রাবলী*'তে লিখেছিলেন, 'আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে, তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার উপযুক্ত নয়।' রবীন্দ্রনাথের কবির এই স্বভাবটি তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মত নাট্যরচনায়ও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নাটক কাব্য লক্ষণাক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিয়ষবস্তু নির্বাচনে যেমন বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তেমনি আঙ্গিক ও অপরাপর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রপূর্ব নাটকে বাইরের ক্রিয়া ও সংঘর্ষের প্রাধান্য ছিল, তিনি তা পরিহার করে হৃদয়ের

[৭] সাইফুল ইসলাম, *রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, মে ২০০৩, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে সচেষ্ট হন। তিনি নাটকে যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তুলনারহিত। মঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমগ্র জীবন অভিনয়ের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর নাট্যরচনায় তাই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শন অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির মত নাটকেও রূপায়িত করে তুলেছেন। এদিক থেকে তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মাধ্যমে তিনি আপন আদর্শবাদ এবং ধর্মনির্ভর দুরূহ জীবনতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অধ্যাত্মজীবনের নিগূঢ় রহস্য তাঁর নাট্যকৌশলের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে অতুলনীয় ভাষাসৃষ্টিতে। তাঁর ভাষার অনুপম বৈশিষ্ট্যের জন্য নাটকগুলো আবেগপ্রধান ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। তিনি সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষা বক্তব্য প্রকাশের অত্যধিক উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটককে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। গীতিনাট্য হিসেবে *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১), *কালমৃগয়া* (১৮৮২) ও *মায়ার খেলা* (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে *রুদ্রচণ্ড*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ* প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচিত হয়েছিল। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয়, তাঁর নাট্যপ্রতিভা কখনও সঙ্গীত, কখনও কাব্যাশ্রিত ছিল। *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *রাজা ও রানী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *মালিনী* (১৮৯৬) প্রভৃতি তাঁর কাব্যনাট্য। *চিত্রাঙ্গদা* থেকে রবীন্দ্রনাটকে নাট্যধর্মিতা অপেক্ষা কাব্যধর্মিতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যনাট্যের কোন কোনটির মধ্যে গদ্য পদ্য সংলাপের মিশ্রণ ঘটেছে। কাব্যনাট্যে কাব্য হচ্ছে উপায় এবং নাটক উদ্দেশ্য। এতে কাব্যরীতি অবলম্বন করলেও নাটকীয়তা প্রাধান্য পায়। *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন* এ ধরনের নিদর্শন। কতগুলো রচনায় নাট্যধর্ম অপেক্ষা কাব্যধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে বলে সে সব নাট্যকাব্য নামে পরিচিত। *বিদায় অভিশাপ* এই শ্রেণির নাট্যসৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

সাংকেতিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক নাটক ছিল না। এ ধরনের সাংকেতিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *শারদোৎসব* (১৯০৮), *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০৬), *রাজা* (১৯১০), *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর* (১৯১২), *ফাল্গুনী* (১৯১৬), *মুক্তধারা* (১৯২২), *রক্তকরবী* (১৯২৬), *কালের যাত্রা* (১৯৩২), *তাসের দেশ* (১৯০৩) ইত্যাদি। সামাজিক নাটক হিসেবে *শোধবোধ* (১৯১৬) *গৃহপ্রবেশ* (১৯২৫) ও *বাঁশরী* (১৯৩৩) উল্লেখযোগ্য। নৃত্যনাট্য রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *নটীর পূজা* (১৯২৬), *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৭), *শ্যামা* (১৯৩৯) প্রভৃতি তাঁর নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত কবি। তাই তাঁর নাট্যরচনায় কবিসুলভ বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হয়ে, আবেগ কল্পনা তত্ত্ব ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তাঁর নাটক কবি প্রত্যয়েরই বাহন। তবে তা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় স্বতন্ত্র নাট্যসৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের অভিনয় জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রথমপর্বে গীতিনাট্যের মাধ্যমে ঘটনার প্রবাহে পাত্রপাত্রীর বিভিন্ন প্রকারের ভাবাবেগ বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে তিনি সমকালীন অন্যান্য নাট্যকার থেকে ভিন্ন গোত্রে চিহ্নিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বহির্মুখ, বাস্তব আখ্যানভাগকে অবলম্বন করে ঘটনা সংকুল দীর্ঘ নাটক লিখেছেন, যাতে অনুসৃত হয়েছে এলিজাবেথীয় পঞ্চ অঙ্কের রীতি। অন্যদিকে পুরাণ-মহাভারত-রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্যনাট্যে ভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বাস্তবপন্থী আখ্যানভাগ ত্যাগ করে তাঁর নিগূঢ় ভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশের জন্যে *গীতাঞ্জলি* পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন রূপক-সাংকেতিক নাটক। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা নাটকে নব দিশারী স্বয়ম্ভূ। সমাজ পরিবেশ নিয়েও তিনি সামাজিক ও কৌতুকনাট্য রচনা করেছেন। আবার সংগীতকে বাহন করে লিখেছেন ঋতুনাট্যগুলি। পরিশেষে সুরের সঙ্গে নৃত্যের সম্মিলনে অতি সূক্ষ্মভাবকে অভিনবরূপে প্রকাশ করেছেন নৃত্যনাট্যসমূহে। মূলত নাটকের বিষয় নির্বাচনে, জীবনদর্শন প্রতিফলনে, মঞ্চকৌশলে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের সংশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকে স্বতন্ত্র ধারার নাট্যকার। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

বিচিত্রধারার সৃষ্টিকর্মের নিরীক্ষাপ্রবণ মানসিকতার সচল প্রতিরূপ নাটকে পরিলক্ষিত হয়। এখানে বিশ্বকবি ও নাট্যকার একাত্ম। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত কবি। তাই তাঁর নাট্যরচনায় কবিসুলভ বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হয়ে আবেগ কল্পনা তত্ত্ব ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তাঁর নাটক কবি প্রত্যয়েরই বাহন। তবে তা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ''রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আরম্ভ গীতিনাট্যে, অবসান নৃত্যনাট্যে। নাট্যরচনার বিবিধ কর্ম লইয়া রবীন্দ্রনাথ আজীবন অনুশীলন করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।''[৮]

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকারগণ বাংলা নাটকে তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদানের সাহায্যে প্রাচুর্য আনয়ন করেছেন। এই পর্যায়ে একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১)। তিনি যুগের অনুরোধে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করে নাট্যমঞ্চে স্বাদেশিকতার আবেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রায় ত্রিশখানি নাটক লিখেছেন। তাঁর খ্যাতির পশ্চাতে ঐতিহাসিক নাটক রচনার গুরুত্ব বিদ্যমান। *গৈরিক পতাকা* (১৯৩০), *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮), *রাষ্ট্রবিপ্লব* (১৯৪৮), *ধাত্রীপান্না* ইত্যাদি তাঁর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর *রক্তকমল* (১৯২৯) *স্বামী-স্ত্রী* (১৯৩৭), *তটিনীর বিচার* (১৯৩৯), *ঝড়ের রাতে* (১৯৩১) ইত্যাদি সামাজিক নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন নাটক গবেষণায়। এ বিষয়ে সমালোচকের মতামত :

> প্রায় ৭০ বছর আয়ুষ্কালের নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জীবনের প্রায় অর্ধেক সময়টাই ব্যয় করেছেন নাট্যসাধনায়। নিরলস একনিষ্ঠ সাধক এই নাট্যকার রঙ্গমঞ্চ, অভিনেয়তা ও উপযোগিতা, উন্নতমানের আধুনিক টেক্‌নিক এবং বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নানা স্তরের প্রভূত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছেন।[৯]

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৭০) বিশ-পঁচিশখানি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলো দর্শকদের মন জয় করেছিল। তবে নাট্যকলায় উৎকর্ষ দেখানো তাঁর

[৮] শ্রীসুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ*, ইস্টার্নপাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৩১৪

[৯] অমৃতলাল বালা ও ঊষা রাণী সরকার, *শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের : সিরাজদ্দৌলা*, সাহিত্য বিলাস, বইমেলা ২০১২ , পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক: *অহিংসা*, *সত্যের সাধন*, *রাঙ্গারাখী*, *অসবর্ণা*, *আঁধারে আলো*, *রীতিমত* নাটক ইত্যাদি। মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) পৌরাণিক নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি পৌরাণিক নাটকে নতুন ধরনের রীতি অবলম্বন করেছেন। অন্যান্য শ্রেণির নাটকেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে নাটকে অনাবিষ্কৃত রহস্য ও অনাস্বাদিত রস পরিবেশিত হয়েছে। *কারাগার* (১৯৩০), *দেবাসুর* (১৯২৮), *অশোক* (১৯৩৪), *সাবিত্রী*, *চাঁদসদাগর*, *সীতা* ইত্যাদি এই শ্রেণির নাটক। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। ''তাঁর কারাগার নাটকটি পৌরাণিক পট-ভূমিকায় স্থাপিত হলেও এর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ইঙ্গিত আবিষ্কার দুরূহ নয়।''[১০]

কৈশোরে গ্রাম্য যাত্রাদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। *আলেয়া* (১৯৩১), *মধুমালা* (১৩৩৭), *ঝিলিমিলি* (১৯৩০) ইত্যাদি তাঁর নাট্যসৃষ্টি। *আলেয়া* নাটকটি প্রতীকধর্মী। এতে ত্রিশটি গান সংযোজিত হয়েছিল। নাটকের চরিত্র বাস্তবানুগামী হয়নি এবং চরিত্রগুলো তত্ত্বের বাহন হয়ে উঠেছিল। তবে সংলাপ রচনায় দক্ষতার পরিচয় ছিল। *মধুমালা* তাঁর গীতিনাট্য পল্লীগীতিকার কাহিনি অবলম্বনে এর রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই গীতি নাট্যের ভাষা সঙ্গীতধর্মী ও আবেগপ্রধান। *ঝিলিমিলি* গীতিনাট্যটিতে নরনারীর প্রেম ও বিরহ প্রাধান্য পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম কৈশোর কালেই যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে গীতিনাট্য রচনা করে নাট্যরচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কবি ও গীতিকার হিসাবে তিনি যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাট্যকার হিসাবে তেমন ব্যাপক হতে পারেনি।

মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-৮৪) প্রায় চল্লিশখানি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটক ঐতিহাসিক ও সামাজিক শ্রেণিভুক্ত। *রানী ভবানী*, *রানী দুর্গাবতী*, *মহারাজা নন্দকুমার*, *টিপু সুলতান*, *পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য

[১০] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ৫৪৩

Dhaka University Institutional Repository

নাটক। বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-৮৬) *মাটির ঘর, মেঘমুক্তি, তাইতো, বিশ বছর আগে, ক্ষুধা* ইত্যাদি; প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৫) *ঋণাং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ, মৌচাকে ঢিল, পরিহাস বিজলিপতম, ভূতপূর্ব স্বামী* ইত্যাদি; বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) *শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর, মন্ত্রমুগ্ধ, মধ্যবিত্ত, বন্ধনমোচন*, ইত্যাদি; বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-৭৮) *নবান্ন, গোত্রান্তর, জনপদ, কলঙ্ক, মরাচাঁদ, অবরোধ* ইত্যাদি; তুলসী লাহিড়ী (১৮৭৯-১৯৫৯) *পথিক, ছেঁড়াতার* ইত্যাদি নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, বাদল সরকার প্রমুখ। এসকল নাট্যকারদের রচিত নাটকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) প্রবীণ নাট্যকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কবি হিসেবে খ্যাতিমান, কথাসহিত্যিক হিসেবেও তাঁর অবদান রয়েছে। তবে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিদ্যমান। বিভাগপূর্ব যুগে নাট্যরচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন পরবর্তীকালে এই গতিধারা অব্যাহত ছিল। *মসনদের মোহ, আনারকলি, সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী* তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকায় প্রণয়চিত্রের রূপায়ণই নাটকগুলোর উদ্দেশ্য। তিনি কতকগুলো বেতার নাটকও রচনা করেছিলেন। মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি শাহাদাৎ হোসেনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে। জতীয় জীবনে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাটকে। বিশেষ আদর্শবোধ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল। ''শাহাদাৎ হোসেন শুধু কবিই ছিলেন না, নাটক রচনাতেও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।''[১১] যাঁর মনের ভেতরে একজন অভিনেতা বাস করে না, নাটক তাঁর হাতে ভাল হয় না। শাহাদাৎ হোসেন আযৌবন বাংলার নামকরা অভিনেতাদের শিল্প-দক্ষতার অনুরাগী ছিলেন এবং নিজে এ শিল্প আয়ত্ত্ব করতেন। এই জন্য তাঁর রচিত নাটক উপভোগ্য হওয়া সম্ভব হয়েছে।

[১১] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শাহাদাৎ হোসেন, জীবনী গ্রন্থমালা*-৩ (ভূমিকা), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের রচয়িতা। *কামাল পাশা* (১৯২৭) ও *আনোয়ার পাশা* (১৯৩০) নাটকে তুরস্কের নবজন্মের কথা বলা হয়েছে। নিজেদের জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চারের জন্যও এগুলোর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। *কাফেলা* (১৯৫৬) তাঁর সামাজিক নাটক। সমাজ জীবনে জাতীয়তাবোধের চেতনা সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি মুসলিম ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন। ঐতিহ্য চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'নাটক রচনায় তাঁর এই সমকালীন বৈশিষ্ট্য তিনি অনুসরণ করেছে। ভাষার সরলতা, সহজ বক্তব্য ও রসমধুর সংলাপ তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য।'[১২]

আকবর উদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮) কতিপয় জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলোর নাম : *নাদির শাহ* (১৯৫৩), *সিন্ধুবিজয়* (১৯২৮), *মুজাহিদ* (১৯৬০) ও *আজান* (১৯৪৬)। প্রথম তিনটি নাটক ইতিহাসের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। অপর নাটক *আজানের* উপজীব্য সামাজিক বিষয়বস্তু। আকবর উদ্দিন ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। *আজান* নাটকে সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ লক্ষণীয়। তাঁর অপর ঐতিহাসিক নাটক *সুলতান মাহমুদ*। জাতীয় জীবনের নবরূপায়ণের জন্য তিনি অতীত গৌরবকে তাঁর নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তঁার নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেছেন-

> সমকালীন সাহিত্যচেতনা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর নাটকগুলো ঘটনামুখ্য, চরিত্র চিত্রনের দিকে নাট্যকারের মনোনিবেশ কম, তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীয় চরিত্রের ওপর; অধিকাংশ নাটকই ঐতিহাসিক পটভূমিতে লিখিত এবং এগুলি বিশেষ আদর্শের অভিসারী।[১৩]

বস্তুত সমসাময়িককালের জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে জাতিকে সঠিক পথের দিকনিদের্শনা, শৌর্য-বীর্য, ঐক্য-ঈমান-শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধকরণের স্বরূপে তাঁর নাটকগুলোর মূল্য অপরিসীম। জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-৭৬) প্রধান পরিচয় কবি

[১২] বশীর আল হেলাল, *ইবরাহীম খাঁ, জীবনী গ্রন্থমালা-১৩*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৩

[১৩] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *আকবরউদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-৪*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হলেও কয়েকটি নাটক রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। কাব্যের পাশাপাশি নাটকে গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা কাব্যসাধনার বৈশিষ্ট্যের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। *পদ্মপার* (১৯৫৩), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *মধুমালা* (১৯৫১), *পল্লীবধু* (১৯৫৬), *ওগো পুষ্পধনু* (১৯৬৮) প্রভৃতি তাঁর গীতিনাট্য। *মধুমালা*'য় লোকসাহিত্যের উপাদান স্থান পেয়েছে। অন্যান্য নাটকে গ্রামের মানুষের দ্বন্দ্বসংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য হচ্ছে-

> জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য বা গীতিনাট্যে পুরানো লোকনাট্যের নবরূপায়ণ ঘটেছে। পল্লীজীবনের যথাযথ চিত্র ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে এগুলোর কিছু অবদান রয়েছে। পল্লীকবি হিসেবে জসীমউদ্‌দীনের যে স্বতন্ত্র পরিচিতি তার সঙ্গে এসবের যথার্থ সঙ্গতি রয়েছে।[১৪]

কবি হিসাবে তিনি যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভা তেমন ব্যাপক হতে পারেনি। আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর *একটি সকাল*, *আলোক লতা* (১৯৩৫), *স্বয়ম্বরা* (১৯৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থ একাঙ্কিকা সঙ্কলন। এসব সাহিত্যসৃষ্টিতে নাটকীয় কলাকৌশলের চেয়ে গাল্পিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। *একটি সকাল* একাঙ্কটি শিল্প-কৌশলের দিক থেকেও একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্ম সংঘাত সৃষ্টিতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। কৌতূহল পরিপূর্ণ মাত্রায় শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে এবং শেষ পর্যায়ে একটা ছোটগল্পের বিস্ময় ও অতৃপ্তি অনুভব করা যায়। সমস্ত কাহিনী যে একটি রহস্য ঘেরা পরিমণ্ডলের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল সেটা সহসা টের পাওয়া যায় একেবারে পরিসমাপ্তির মুখে এসে। তখন মনে যে একটি প্রচণ্ড সাড়া লাগে তার সাথে একমাত্র তুলনা হয় ছোটগল্পের। সমাপ্তির পর তাকে নিয়ে মন বেশ কিছুক্ষণ আবিষ্ট থাকতে পারে, যেন 'শেষ হয়ে হইল না শেষ', ওটা ছোটগল্পেরই ধর্ম। ছোটগল্পে অভ্যস্ত শিল্পী আবুল ফজল এইভাবে এখানে ছোটগল্পের খানিকটা স্বভাবধর্ম সার্থকভাবে আমদানি করে একাঙ্কিকাটিকে অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত করে

[১৪] মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *জসীমউদ্‌দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-১৫*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

তুলেছেন। আবুল ফজল এসব একাঙ্কিকায় কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এসবের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। তাই সমাজচিত্র হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। তবে তাঁর নাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের বিয়ষবস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজজীবন প্রতিফলনে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

নাট্যকার হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আযিমউদ্দিন (১৯০৪-৭৩)। তাঁর বিখ্যাত *মহুয়া* (১৯৫২) নাটকটি লোকসাহিত্যের কাহিনীভিত্তিক। প্রেমের সুতীব্র আকর্ষণে জীবন বিসর্জনের এক বেদনাতুর কাহিনী এই নাটকের বক্তব্য। *মা* (১৯৬০) তাঁর অপর বিখ্যাত নাটক। সামাজিক জীবনাদর্শনের পরিচয় এতে বিধৃত। আযিমউদ্দিনের অপরাপর নাট্যসৃষ্টি হিসেবে *অহঙ্কার* (১৯৬০), *কাঞ্চন* (১৯৬২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯০১) সামাজিক জীবনের সমকালীন সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাঁর *স্মাগলার* নাটকটি দেশাত্মবোধ ও সমাজের দুর্নীতি সম্পর্কে রচিত।

সজাগ অনুভূতি, সুতীক্ষ্ণ রসবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ নুরুল মোমেনের (১৯০৬-৮৯) নাটকের বিশিষ্টতা। *রূপান্তর* (১৯৪৭), *যদি এমন হোত* (১৯৬০), *নয়া খান্দান* (১৯৬২), *আলোছায়া* (১৯৬২), *যেমন ইচ্ছা তেমন* (১৯৭০), *শতকরা আশি* (১৯৬৭) ইত্যাদি তাঁর নাট্যগ্রন্থ। এছাড়া তাঁর বহু একাঙ্কিকা বেতারে প্রচারিত হয়েছে। অনেকগুলা পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম নাটক *রূপান্তর* প্রকাশের ফলেই নুরুল মোমেন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব *নেমেসিস* (১৯৪৮) নাটক রচনায়। এক চরিত্রের এই নাটকটি বিশেষ আঙ্গিকে রচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে গড়ে ওঠা বিত্তশালী জনৈক লোকের মনোজগতের দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্বের চিত্র এ নাটকে প্রতিফলিত। অন্যান্য নাটকে নুরুল মোমেন সমাজের সমকালীন সমস্যাদি রূপায়িত করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের চিত্র রূপায়ণের ফলে সেসব যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। ''আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং সংলাপের আকর্ষণীয়তা তাঁর নাটকের

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্টতা দান করেছে।"[১৫] তাঁর সমাজের প্রতি দৃষ্টি ছিল নিতান্তই বাস্তবসম্মত। সেজন্য তিনি ঐতিহাসিক বা দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় আগ্রহ দেখাননি। সমকালীন জীবনকে তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি তৎপরতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকের সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত। হাস্যরসিকতায় তাঁর সংলাপ সমুজ্জ্বল। অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়কে তিনি রসমধুর করে প্রকাশ করেছেন।

সমাজের মানুষের মধ্যে বিরাজমান উঁচু-নিচু ব্যবধান নিয়ে আফরাফুজ্জামান (১৯১১) লিখেছেন *সয়লাব* (১৯৫৬) নাটকটি। সমাজের মানুষের মধ্যে বিরাজমান উঁচু-নিচু ব্যবধান নিয়ে নাটকটি রচিত। গল্প উপন্যাস ও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬) অনেকগুলো নাটক রচনা করেছেন। সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রকাশিত নাটকগুলোর নাম: *উত্তর ফাল্গুনী* (১৯৬৬), *একে একে এক* (১৯৭৬), *ঝড়ের পাখি* (১৯৫৮), *ত্রিমাত্রিক*, *ধানকলম* (১৯৭৬), *যা হতে পারে* (১৯৬২), *শিলা ও শৈলী* (১৯৬৭), *সুর ও ছন্দ* (১৯৬৭), ইত্যাদি। সমকালীন জীবনের চিত্র ও সমস্যা তাঁর নাটকের উপজীব্য। তাঁর নাটকের সংলাপ মধুর ও মার্জিত। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, দেশাত্মবোধ ও নিসর্গপ্রীতি তাঁর সাহিত্যকর্মে মনোরমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নাটকের সংলাপ মধুর ও মার্জিত। সমকালীন জীবনের চিত্র ও সমস্যা তাঁর নাটকের উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আলী মনসুরের (১৯২৫) *পোড়োবাড়ী*, *বোবা মানুষ*, *দুর্নিবার*, *শেষ রাতের তারা* ইত্যাদি নাটক হিসেবে বিশিষ্ট। তাঁর নাটকে গ্রাম্যজীবনের ব্যথাবেদনার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। ওবায়েদ-উল-হক (১৯১১-২০০৭) *দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার* (১৯৫০), *এই পার্কে* (১৯৬৩), *ভোটভিখারী*, *ব্যতিক্রম*, *রুগ্নপৃথিবী* (১৯৫৮) প্রভৃতি নাটকে বর্তমান সমাজের বাস্তব সমস্যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সমাজের অন্যায় আনাচার সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি নাটকে প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি সমাজের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

[১৫] নুরুল মোমেন, *নেমেসিস*, কল্লোল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্রষ্টব্য: ভূমিকা, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের যে সম্পৃক্ততা থাকে তার পরিচয় এসব নাটকে বিদ্যমান। সময়ের প্রয়োজন মিটানোর দিকে নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল।

ইব্রাহিম খলিল (১৯১৬-৭৪) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলোর নাম: *ফিরিঙ্গীরাজ*, *স্পেনবিজয়ী মুসা* (১৯৯৫), *ফিরিঙ্গী হার্মাদ* (১৯৫৬), *সমাধি* ইত্যাদি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত নাটকে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রেরণা রয়েছে। জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রেরণা এসব নাটকে লক্ষণীয়। চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়েনা, সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুদৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না; না পারলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে। কথাটা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানকে উৎসাহিত করাই ছিল তাঁর এ প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটা ছিল সেইসব দিনের কথা, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রবেশ ছিল যখন ভীরু-সংকুচিত পদক্ষেপে। বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের এই ভীরু সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব অবশ্য নজরুলের আবির্ভাবের পরই এক লহমায় ঘুচে গিয়েছেল।

ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) সবচাইতে বড় পরিচয় তাঁর আপোসহীন আদর্শবাদিতা, তাঁর নিরাপোস সংগ্রামশীলতা। ইসলামের দৃষ্টিতে সার্থক সংগ্রামী জীবন, মর্দে-মুমিনের জীবন গড়ে তুলতে বড় প্রয়োজন সংগ্রামের পাশাপাশি সাধনা, আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলবার সাধনা। এখানেই ইসলামে আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্ব। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১) নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন। আঙ্গিকের পরীক্ষা হিসেবে গ্রন্থটি বিশিষ্টতার অধিকারী। পুঁথিসাহিত্যের জনপ্রিয় কাহিনী এখানে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> *নৌফেল ও হাতেম* ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে।[১৬]

সিকানদার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*, *বাংলা ছাড়ো* প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা সিকানদার আবু জাফর নাট্যকার হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। ''সিকানদার আবু জাফর মূলত কবি; অতঃপর নাট্যকার।''[১৭] তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৫), *মাকড়সা* (১৯৬০), *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬২) এবং *মহাকবি আলাওল* (১৯৬৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সিরাজউদ্দৌলা* ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয় চেতনা ঐতিহ্য ও প্রেরণা হিসেবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি আলাওলের জীবনকাহিনী *মহাকবি আলাওল* জীবনী নাটকে স্থান পেয়েছে। কবির সংঘাতময় জীবনালেখ্য নাটকের উপজীব্য। বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এসব নাটকের বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সত্য উদ্‌ঘাটনে নাট্যকার তৎপর ছিলেন। সিকানদার আবু জাফর যে সময়ে নাটক লিখেছেন সেসময়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর নাটকে জনমানুষের মুক্তির কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) নাটক রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার। সমাজজীবনের বিচিত্র পরিচয় তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। শানিত ব্যঙ্গ তাঁ র নাটকের অনুষঙ্গী। তাঁ র গল্প-উপন্যাসে যেমন সমাজ-জীবনের চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি তাঁর নাটকেও সমকালীন জীবনের বিচিত্র সমস্যা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *তস্কর লস্কর* (১৯৫৩), *কাঁকরমণি* (১৯৫২), *বাগদাদের কবি* (১৯৫২), *এতিমখানা*, *ডাক্তার*

---

[১৬] শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ (সম্পাদিত), *ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ব্যক্তি ও কবি*, ইফাবা প্রকাশনা, ১৪২/২, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফাল্গুন ১৩৯০, পৃ. ৩৫৭

[১৭] মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্‌দার আবুজাফর : কবি ও নাট্যকার*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লার কারখানা (১৯৭৩), *তিনটি ছোট নাটক* (১৯৮৯), *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা* (১৯৯৩) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভা তেমন ব্যাপক হতে পারে নি, তবুও স্বল্প সংখ্যক নাটকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

নাট্যরচনায় আবদুল হক (১৯১৮-৯৭) কৃতিত্ব পেয়েছেন কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনায় এবং কতিপয় নাটকের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। সমকালীন সমাজজীবন তাঁর নাটকের উপজীব্য ছিল। আবার বিদেশি নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে উন্নতমানের নাটকের আদর্শ উপস্থাপনায় তিনি তৎপর ছিলেন। আবদুল হক রচিত নাটকগুলো হল : *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬), *ফেরদৌসী* (১৯৬৪), *সোনার ডিম* (১৯৭৬)। তাঁর অনুবাদ নাটকগুলোর তালিকা খানিকটা দীর্ঘ যেমন : *পুতুলের সংসার* (১৯৬৫), *প্রেতাত্মা* (১৯৬৬), *মহাস্থপতি* (১৯৬৬), *রস মার্স হোম* (১৯৬৭), *হেড্ডা গাবলার* (১৯৬৭), *জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান* (১৯৬৮), *ইলিনয়ে এ্যাবলিংকন* (১৯৬৭) ইত্যাদি।

আবদুল হক *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬) নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বহুবিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা অবলম্বনে নাটকটি রচিত। তাঁর অপর নাটক *ফেরদৌসী* (১৯৬৪)। বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার অধিকারী এই নাট্যকার সমকালীন সমাজকে তাঁর নাটকে রূপায়িত করে বাংলাদেশের নাটকের বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছেন। কাহিনী উপস্থাপনায়, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রনে ও সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব বিদ্যমান। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে ফেরদৌসী গুরুত্বপূর্ণ। *সোনার ডিম* (১৯৭৬) তাঁর অপর নাটক। তিনি অনেকগুলো বিদেশি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবসেনের *ডলস হাউস* নাটকের অনুবাদ *পুতুলের সংসার*, *গোস্ট* নাটকের অনুবাদ *প্রেতাত্মা*, *দি মাস্টার বিল্ডার* নাটকের অনুবাদ করেছেন *মহাস্থপতি* নামে। তাঁর অনুবাদে আছে সহজবোধ্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) *দুয়ে দুয়ে চার* (১৯৬৪), *নব মেঘদূত*, *মনোনীতা*, *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪), *সূর্যাস্তের পর* (১৯৭৪) নাটকে সমাজের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করে তুলেছেন। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস ও অনুবাদে তাঁর দক্ষতার মত নাটকেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। পারিবারিক জীবনের নানা উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছিল তাঁর নাট্যভুবন। সমাজ সচেতন লেখিকা হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেজন্য সমাজের নানাবিধ সমস্যা তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪), *বহিপীর* (১৯৬০) ও *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২) নাটকের রচয়িতা। তাঁর উপন্যাসের মত নাটকও আঙ্গিকগত দিক থেকে বিশিষ্ট। *বহিপীর* তাঁর পুরস্কৃত নাটক। এতে সমাজজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজসচেতন নাট্যকার হিসেবে এখানে তাঁর পরিচয় প্রকাশমান। ''বহিপীর সামাজিক কুসংস্কারের উপর এক নীরব প্রতিবাদ।''[১৮] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ* আঙ্গিক পরীক্ষায় একটি সার্থক নাটক। আঙ্গিক রূপায়ণে ও সংলাপ সংযোজনায় তাঁর বিশিষ্টতা বিদ্যমান। তিনি সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষে তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনে যেমন তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি নাটকের আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের সমস্যা তাঁর নাটকে এসেছে, কিন্তু তা পরিবেশিত হয়েছে গতানুগতিকতার বাইরে। এর ফলে নাট্যরসিকের কাছে তা চমকপ্রদ বলে বিবেচিত হতে পারে। সৈয়দ আকরম হোসেন *তরঙ্গভঙ্গ* নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-

> বিষয়নির্বাচন, ঘটনা-উপস্থাপনরীতি, মানুষের অন্তর্বাস্তবতার প্রতীকী উন্মোচন এবং সংলাপের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব নির্মাণে 'তরঙ্গভঙ্গ' বাংলা নাটকের ধারায় আন্তর্জাতিক রীতিমার্জিত ও স্বতন্ত্র। এ-নাটক মূলত এক্সপ্রেশনিষ্টিক; পরিচর্যারীতিতে 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের মতো চেতন-অবচেতন বিজড়িত মনঃপ্রবাহরীতির সূত্রগুচ্ছ সক্রিয়। এক্সপ্রেশনিষ্টিক নাটকের অবয়ব নির্মাণে 'তরঙ্গভঙ্গ'তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

[১৮] সৈয়দ অবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, তাম্রলিপি, (পুনর্লিখিত) দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

> কাফকার 'দ্যা ট্রায়াল' দ্বারা অনেকাংশ অনুপ্রাণিত। আমেনার বিচার সূত্রে জজ সাহেবের বিষণ্নতা ও ব্যর্থতাবোধ, চরিত্রপুঞ্জের অবয়ব এবং ঘটনাংশের বস্তু ও পরিবেশ-ভিত্তি মানুষের পরিচিত পরিমণ্ডলের নিকবর্তী মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা চেতন-অবচেতন-আবৃত এবং মনোজাগতিক।[১৯]

বিষয় নির্বাচনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যেমন অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি নাটকের গঠন কৌশলে নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। কবি ও সমালোচক হিসেবে সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) পরিচিত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হচ্ছে : *কোরবানী, জোহরা ও মুশতারী, জুলায়খা* প্রভৃতি। *ইডিপাস* (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ নাটক। গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিসের পুরাণাশ্রিত নাটক *ইডিপাস রেক্স* অবলম্বনে নাটকটি রচিত। *কোরবানী*, *জোহরা ও মুশতারী* এবং *জুলেখা* জাপানের *নো* নাটকের আঙ্গিকে রচিত। নাটক রচনা ও অনুবাদের পাশাপাশি তিনি জাতীয় সঙ্গীতের ইংরেজি অনুবাদের কাজটি দক্ষতার সাথে করেছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) একটি অত্যুজ্জ্বল নাম হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম স্থপতি মুনীর চৌধুরী ছিলেন একাধারে সফল শিক্ষক, ব্যতিক্রমী নাট্যকার, তীক্ষ্মধী সমালোচক ও দক্ষ অনুবাদক। সাহিত্য ও ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর নিঃসংশয় পাণ্ডিত্য ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। বস্তুত পাকিস্তানি আমলের বাংলাদেশে সৃজনে ও মননে এমন যোগ্যতা অন্য কোনো শিল্পীর মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। উন্নত ধরনের আঙ্গিক এবং তীক্ষ্ণ সংলাপের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে মুনীর চৌধুরীর মর্যাদা। তাঁর নাটকে সমকালীন সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে। নাটকের বিষয়-নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ রচনায় তিনি যে অনন্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছে। বাংলাদেশের নাটকের দিক নির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর অবদান সর্বাধিক বলে বিবেচনা করা যায়। ''মুনীর চৌধুরীর নাট্যরচনা

[১৯] সৈয়দ আকরম হোসেন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জীবনী গ্রন্থমালা*-১৯, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

বৈচিত্র্যধর্মী। সৃজনশীল মৌলিক নাটক, ভাবানুবাদ বা রূপান্তরিত নাটক এবং নাট্যানুবাদ নিয়ে তাঁর নাট্যকীর্তি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।"[২০] মুনীর চৌধুরীর রচিত নাটকগুলো হচ্ছে *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬২), *চিঠি* (১৯৬৬), *কবর* (১৯৫৫), *দণ্ডকারণ্য* (১৯৬৫), *পলাশী ব্যারাক* (১৯৪৮)। তাঁর কতকগুলো অনুবাদ নাটকও রয়েছে। *রক্তাক্ত প্রান্তর* ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হলেও তাতে মানবমানবীর হৃদয়বেদনার পরিচয়ই প্রধানভাবে প্রকাশিত। *কবর* নাটকটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। উন্নত ধরনের আঙ্গিক এবং তীক্ষ্ণ সংলাপের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে এর মর্যাদা। মুনীর চৌধুরীর অন্যান্য নাটকে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। বিষয়-নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ রচনায় মুনীর চৌধুরী অনন্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বাংলাদেশের নাটকের দিকনির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর অবদান সর্বাধিক তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যে নতুন বলয়ের সূত্রপাত ঘটেছে।

মুনীর চৌধুরীর সমকালীন নাট্যকারগণের মধ্যে আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯) বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর নাটকগুলো অভিনয়েও সাফল্য লাভ করেছে। তিনি গ্রাম্যজীবন, ধর্মীয় আদর্শ, দেশাত্মবোধক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *বিরোধ* (১৯৪৭), *পদক্ষেপ* (১৯৪৮), *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৪৯), *শেষ অধ্যায়* (১৯৫২), *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫১), *প্রতীক্ষা* (১৯৫৭), *অনুবর্তন* (১৯৫৩), *বিল বাওরের ঢেউ* (১৯৫৫), *এপার ওপার* (১৯৫৫), *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৫৭), ইত্যাদি নাটকে সমাজের বিচিত্র বিষয় রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নাটক *কর্ডোভার আগে* (১৯৮০), *রাজপুত্র* (১৯৮০), *রাজা রাজ্য রাজধানী* (১৯৮০), *মেঘলা রাতের তারা* (১৯৮১), *কন্যা জায়া জননী* (১৯৮৭) ইত্যাদি। *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *তিতুমীর* (১৯৫৭), *রক্তপদ্ম* (১৯৫৭) প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক। ''ঐতিহাসিক নাটক রচনায় আসকার ইবনে শাইখ প্রচলিত রীতিকে গ্রহন করেছেন।"[২১] অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের নতুন চেতনা সৃষ্টির

[২০] কবীর চৌধুরী, *মুনীর চৌধুরী*, *জীবনী গ্রন্থমালা-১০*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩২

[২১] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে নাট্যকার তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচন করেছেন এবং সমকালীন জীবনের চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে তৎপরতা দেখিয়েছেন।

সমাজের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে সমাজসচেতন নাট্যকার আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৯০) বিশিষ্ট। তাঁর *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এলবাম* (১৯৬৫), *চেহারা* (১৯৭৯), তবুও *অনন্যা* বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য ও সংগ্রামী চেতনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। আনিস চৌধুরীর সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক *মানচিত্র*। নাটকটি লেখা হয়েছে একজন স্কুল শিক্ষকের জীবনকাহিনী নিয়ে। এতে শিক্ষক জীবনের দারিদ্র্য, হতাশা, যন্ত্রণা ও সমস্যার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিদানে তাঁকে প্রবল বঞ্চনা লাভ করতে হয়েছে। *এলবাম* নাটকটি সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত। সহজ সরল সংলাপের মাধ্যমে আনিস চৌধুরী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

নাট্যকার হিসেবে ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) ছিলেন মূলত নিরীক্ষাধর্মী। কয়েকটি নাটক রচনা করে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকের নাম : *মায়াবী প্রহর* (১৯৬৩), *মরক্কোর জাদুকর* (১৯৫৯), *ধন্যবাদ* (১৯৫১), *নিঃশব্দ যাত্রা* (১৯৭২), *সংবাদ শেষাংশ* (১৯৭৫), *জোয়ার থেকে বলছি* (১৯৭৪), *হিজল কাঠের নৌকা* (১৯৭৬), *মেঠোফুলের ঠিকানা* (১৯৭৫), *নরকের লাল গোলাপ* (১৯৭২), *হে সুন্দর জাহান্নাম* (১৯৮৮) ইত্যাদি। তাঁর কাব্যনাট্যের নাম *ইহুদির মেয়ে* (১৯৬২), *রঙিন মুদ্রারাক্ষস* (১৯৯৪) ইত্যাদি। *ইহুদির মেয়ে* তাঁর কাব্যনাট্য। তাঁর *মায়াবী প্রহর* নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব তথা সমাজসচেতনতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে *মরক্কোর জাদুঘর* রূপক নাটক হিসেবে বিবেচ্য।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধনায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ড. রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১)। তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যধর্মী। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি নাটকও রচনা করেছেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নাটকের নাম *আবর্ত* (১৯৫৯), তিনটি একাঙ্কিকা (১৯৮৬)। প্রথম নাটকটি রচনা করেই তিনি এক্ষেত্রে যথার্থ কৃতিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)। তাঁর প্রকাশিত নাটকের মধ্যে *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৪), *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯), *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৫), *শেষ নবাব* (১৯৮৭) উল্লেখযোগ্য। সাঈদ আহমেদ নাট্যরচনা শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে। তিনি লন্ডনে অবস্থানকালে ইউরোপীয় নাট্যগোষ্ঠীর সাহচর্যে নাটক রচনায় ও সঙ্গীতচর্চায় অনুপ্রাণিত হন। তখনই তিনি নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। বিদেশি নাটক রূপান্তরেও তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর বাংলা নাটকগুলোর উৎস হল ইংরেজি নাটক। *দ্যা থিং* এর বাংলা খসড়া করেন বজলুল করিম ও শামসুর রাহমান। সাঈদ আহমদ প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করে *কালবেলা* নামে সেটি প্রকাশ করেন। ''*মাইলপোস্ট* নাটকটি নাট্যকার অনুবাদ করেন আতাউর রহমানের সহযোগিতায়। *সারভাইভেল* নাটকটি সাঈদ আহমদ নিজেই বাংলায় রূপান্তরিত করে নাম দেন *তৃষ্ণায়*। *শেষ নবাব* নাটকটি নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে রচিত।''[২২] সাঈদ আহমদ নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর তিনটি নাটক *কালবেলা*, *মাইলপোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। *কালবেলা* নাটকে পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাট্যাদর্শের আঙ্গিকে সমকালীন মানবভাগ্যের বিপর্যয়কে শিল্পরূপ প্রদান করা হয়েছে। নাটকটি ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে সংঘটিত প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পটভূমিকায় রচিত। নাটকে এই ধরনের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সাহিত্যে অভিনব না হলেও উপস্থাপন-কৌশল এবং সংগঠনশৈলী সম্পূর্ণ নতুন বলে বিবেচনার যোগ্য। বিশ্বজিৎ ঘোষ অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-

[২২] বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়(সম্পাদিত), *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

> বাস্তববাদী নাট্যসংগঠনের পরিবর্তে সাঈদ আহমদ এখানে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাট্যপ্রকৌশল। স্বপ্ন-ব্যাকরণময় কাহিনী বিন্যাস, আপাত অসংলগ্ন সংলাপ, অর্থহীন প্রতীক্ষা *কালবেলা* নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[২৩]

কাব্য ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও নাটক রচনায় জিয়া হায়দারের (১৯৩৬-২০০৮) কৃতিত্ব সর্বাধিক। কয়েকটি মৌলিক নাটক ছাড়াও তাঁর রয়েছে রূপান্তরিত ও অনূদিত নাটক। তাঁর প্রথম নাটক *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০) অভিনবত্বের জন্য প্রশংসনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *এলেবেলে*, *সাদা গোলাপে আগুন ও পংকজ বিভাস* (১৯৮২)। তাঁর রুপান্তরিত নাটক *প্রজাপতির নির্বন্ধ* (১৯৭৩), *তাইরে নাইরে না*, *উন্মাদ সাক্ষাৎকার*, *মুক্তি মুক্তি।* তাঁর অনূদিত নাটক *দ্বার রুদ্ধ*, *ডক্টর ফস্টাস*, *এ্যান্টিগানে* (১৯৮১) ইত্যাদি। নাট্যকলা বিষয়ে তাঁ র ব্যাপক পঠন-পাঠনের প্রেক্ষিতে আধুনিক নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সমকালীন বিষয়বস্তু কল্যাণ মিত্রের (১৯৩৯) নাটকের উপজীব্য। রাজনৈতিক সামাজিক উপকরণ থেকে তিনি নাটকের কাহিনী রূপায়িত করে তুলেছেন। তিনি নাটক রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা অনেক। *দায়ীকে* (১৯৬০), *একটি জাতি একটি ইতিহাস*, *জল্লাদের দরবার*, *মীর জাফর সাবধান*, *সূর্যমহল*, *অন্যন্যা* (১৯৬৭), *চোরাগলি মন* (১৯৬৬), *কুয়াশা কান্না* (১৯৬৭), *টাকা-আনা-পাই* (১৯৬৮), *পাথরবাড়ি* (১৯৭৭), *শুভবিবাহ* (১৯৬৭), *প্রদীপশিখা* (১৯৬৭), *সোনা রূপো খাদ* (১৯৬৮), *অতএব* (১৯৬৮), *সাগর সেঁচা মানিক* (১৯৬৮), *ডাকাত* (১৯৬৭), *ত্রিরত্ন* (১৯৬৭), *শপথ* (১৯৬২), *লালন ফকির* (১৯৭৭) ইত্যাদি কল্যাণ মিত্রের নাটক। *একটি জাতি একটি ইতিহাস* ও *জল্লাদের দরবার* মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। তাঁর নাটকের অভিনয় সাফল্য থেকে জনপ্রিয়তার পরিচয় মিলে।

---

[২৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন রশীদ হায়দার (১৯৪১)। গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ অনুবাদের পাশাপাশি নাটক রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত নাটকগুলো হল : *তৈল সংকট* (১৯৭৪), *শেক্সপীয়র দ্যা সেকেন্ড* (১৯৮৫), *গোলাপ গোলাপ* (১৯৭৮) তাঁর কিশোর নাটক। আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮) নাটক রচনা অভিনয় ও নির্দেশনায় প্রভূত সাফল্য লাভ করেছিলেন। সমাজ বাস্তবতা তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। সমাজের বিচিত্র ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটে তাঁর নাটকগুলোর চরিত্রে। তিনি সমাজকে দেখেন অত্যন্ত রূঢ় ভঙ্গিতে, কখনও ব্যঙ্গের চাবুকে। তাই সমসাময়িক জীবন এবং সে জীবনের নানা প্রকার অসঙ্গতি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেন। নাট্যকারেরা সমাজ, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন আবদুল্লাহ আল-মামুন তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রকাশিত নাটকের মধ্যে *শপথ* (১৯৬৪), *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫), *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৭৮), *সেনাপতি* (১৯৮০), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০), *ক্রসরোডে ক্রসফায়ার* (১৯৮৩), *চারদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), *তোমরাই* (১৯৮৮), *দূরপাল্লা* (১৯৮৮), *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮), *আমাদের সন্তানেরা* (১৯৮৮), *কোকিলারা* (১৯৯০), *তিনটি পথনাটক* (১৯৯১), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র* (১৯৯৩), *স্পর্ধা* (১৯৯৬), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (নাট্যরূপ ১৯৯৭), *ঘরে বাইরে* (নাট্যরূপ), *কুরসি*, *বিবিসাব* (১৯৯১), *তাহারা তখন*, *একা* (সংলাপবিহীন নাটক), *জিরো পয়েন্ট* (১৯৯০), *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সচেতন শিল্পীর দৃষ্টিতে তাইতো তাঁর নাটকে এর প্রভাব স্পষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন-

> স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিচ্যুতি আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামীতা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক নাটক। এধারায় উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে তাঁর নাট্য ভুবন।[২৪]

একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে মঞ্চ সম্পর্কে মমতাজউদ্দিন আহমদের (১৯৩৫) অভিজ্ঞতা নাট্যরচনায় কাজে লেগেছে। তাঁর মৌলিক নাট্যরচনার পাশাপাশি রূপান্তরিত নাটক ও নাটকের নবরূপায়ণও রয়েছে। তাঁর মৌলিক নাটক : *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা* (১৯৭৩), *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৪), *হরিণ চিতা চিল* (১৯৭৪), *বিবাহ* (১৯৭৯) *কী চাহ শঙ্খচিল* (১৯৭৬), *চয়ন তোমার ভালোবাসা* (১৯৭৮), *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (১৯৭১), *এবারের সংগ্রাম* (১৯৭১) *স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১), *বর্ণচোর* (১৯৭২), *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮২), *এই সেই কণ্ঠস্বর*, *এই রোদ এই বিষ্টি*, *বুড়িগঙ্গার সিলভার জুবিলী*, *হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার*, *নাট্যত্রয়ী*, *প্রেম বিবাহ সুটকেস*, *ক্ষতবিক্ষত*, *রঙ্গ পঞ্চদশ*, *সাত ঘাটের কানাকড়ি*, *রাক্ষুসী*, *আমাদের শহর*, *দুই বোন*, *পুত্র আমার পুত্র*, *দশটি রগড় নাটিকা*, *হাস্য লাস্য ভাষ্য*, *একই নাটক চার রকম*, *তরুকে নিয়ে নাটক* ইত্যাদি। একাঙ্ক নাটক রচনায়, নাট্যরূপে ও রূপান্তরে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাঙ্গ সংলাপ রচনায় তাঁর একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ''মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন।''[২৫] মমতাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীনতার আগে থেকে নাটক লিখলেও নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন স্বাধীনতার পরে ।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী পর্যায়ে। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। তাঁর রচিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *নূরলদীনের সারা জীবন* (১৯৮২), *এখানে এখন* (১৯৮৮), *কাব্যনাট্য সমগ্র* (১৯৯১), *ঈর্ষা* ইত্যাদি অভিনয় সফল কাব্যনাটক। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর

[২৪] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* , প্রথম আজকাল সংস্করণ : বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৬১

[২৫] রামেন্দু মজুমদার, *স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাটক* : নাট্যান্দোলন, থিয়েটার, নভেম্বর, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

পদচারণা ছিল বলে তাকে সব্যসাচী সাহিত্যিক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন-

> *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ নিয়ে রচিত তাঁর সর্বাধিক সার্থক ও মঞ্চসফল কাব্যনাট্য। ভাষার গতিময়তা, গ্রামীণ জীবন থেকে নেয়া উপমার অসাধারণ ব্যবহার *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।[২৬]

নাটক রচনায় আঙ্গিক রূপায়ণে ও বিষয় নির্বাচনে নতুনত্ব দেখিয়েছেন ড. সেলিম আল-দীন (১৯৪৮-২০০৮)। নতুন নতুন নাটক রচনায় তিনি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র তাঁর নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ তাঁর নাটকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সঙ্গে নাটকের আনা হয়েছে অভিনবত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে : *সর্পবিষয়ক গল্প ও অন্যান্য* (১৯৭৩), *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৮১), *বাসন* (১৯৮৩), *তিনটি মঞ্চ নাটক* (১৯৮৬), *চাকা* (১৯৯০), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৭২), *হরগজ* (১৯৯২), *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬), *অনিকেত অন্বেষণ* (১৯৭৩) ইত্যাদি। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের স্বকীয়তায় *কিত্তনখোলা* সেলিম আল-দীনের এক বিশিষ্ট অবদান। এ নাটকে ক্রুদ্ধ-স্পর্ধিত লেখক চরিত্রের সঙ্গে সহজ-সরল-নিরস্ত্র মানুষের দ্বন্দ্বের ইতিহাস অত্যন্ত সার্থকতার সাথে রূপায়িত হয়েছে। কিত্তনখোলার মানুষেরা সামাজিক শোষণের ভয়াবহতা সত্ত্বেও দুঃসাহসী ও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন, ''*কিত্তনখোলার* দর্শক ও পাঠকবৃন্দ সহৃদয় চিত্তে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, শিল্প মাধ্যম হিসেবে নাটককে আমরা বিস্তৃততর তাৎপর্য দান করতে চাই।''[২৭]

সমকালীন জীবনের চিত্র মামুনুর রশীদের (১৯৪৮) নাটকে বিধৃত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলো হলো : *ওরা কদম আলী* (১৯৭৮), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০),

---

[২৬] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[২৭] সেলিম আল দীন, 'তিনটি মঞ্চনাটক', *কিত্তনখোলা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ইবলিশ (১৯৮২), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *খোলা দুয়ার* (১৯৮৪), *গিনিপিগ* (১৯৮৫), *নীলা* (১৯৮৭), *সমতট* (১৯৯০), *পাথর* (১৯৯৩), *লেবেদেফ* ইত্যাদি। *এখানে নোঙর* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, ভাঙনের মুখে সুরম্য নগর, সমৃদ্ধ জনপদ, বড় বড় সভ্যতা কিছুই টেকে না কিন্তু টিকে থাকে মানুষ তার সংগ্রাম, সর্বোপরি শ্রেণি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। তাই তিনি তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। তাঁর নাটক *ওরা কদম আলী*, *ওরা আছে বলেই*, *ইবলিস*, *এখানে নোঙর*, *খোলা দুয়ার*, *গিনিপিগ* ইত্যাদিতে স্থান পেয়েছে সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-অগ্রযাত্রার ইতিহাস। তাঁর নাটকে অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক অসাম্যে সচেতন হয়ে ওঠে, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিজেরাই শিখে নেয় যে একতাবদ্ধ প্রতিরোধই শ্রেণি শত্রু বিনাশের হাতিয়ার। এসব নাটকে মামুনুর রশীদের শ্রেণি সংগ্রাম চেতনার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে। মানুষ সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ায়, উচ্চারণ করে বিদ্রোহের বাণী। শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে অধিকার-সচেতন ও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে তাঁর নাটক পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। নাটক রচনায় মামুনুর রশীদ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকের কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচনে তিনি শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের জীবন বেছে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১) কিছু সংখ্যক অনুবাদ নাটক রচনা করেছেন। বিদেশি নাটকের ভাবানুবাদে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। ইবসেনের *দি এনিমি অব দি পিপল* নাটকের ভাবানুবাদ *শত্রু* জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর অন্যান্য অনুবাদ নাটক হচ্ছে : ইউজিন ও নীল রচিত *সম্রাট জোন্‌স*, জে.বি, প্রিষ্টলীর *ডেঞ্জারাস কর্নার*-এর অনুলেখন *অচেনা*, ক্রিস্টোফার ফ্রাই-এর *টাইগার এট দি গেট্‌স*-এর অনুবাদ *হেক্টর*, ইউজীন ও নীলের *আহ্ ওয়াইল্ডারনেসের* অনুবাদ *সেই নিরালা প্রান্তর* উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়া তাঁর অন্যান্য অনূদিত নাটক হল *আহ্বান*, *পাঁচটি একাঙ্কিকা*, *শহীদের প্রতীক্ষায়*, *ছায়া*

Dhaka University Institutional Repository

বাসনা, *অমারজনীর পথে*, *প্রাণের চেয়ে প্রিয়*, *জননী সাহসিকা*, *ওথেলো*, *গডোর প্রতীক্ষায়*, *লিলিসট্রাটা*, *বিহঙ্গ*, *ভেক*, *ফেইড্রা*, *হ্যামলেট মেশিন* ইত্যাদি।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) ও অনুবাদ নাটকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদ হচ্ছে : জর্জ বার্নাড শ-র ইউ *নেভার ক্যান টেল* এর অনুবাদ *কেউ কিছু বলতে পারে না*, জন গলসওয়ার্দির *দি সিলভার বকস* এর অনুবাদ *রুপোর কৌটা*, সেক্সপিয়রের *টেমিং অব দি শ্রু* এর অনুবাদ *মুখরা রমণী বশীকরণ* ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর বহু একাঙ্কিকার অনুবাদ পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের *ইডিপাস রেক্স* এর অনুবাদ করেছেন *ইডিপাস* নামে। আবদুল হক (১৯১৮-৯৭) অনেকগুলো বিদেশি নাটকের অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলো হচ্ছে : ইবসেন রচিত *ডলস হাউস* এর অনুবাদ *পুতুলের সংসার*, *দি মাস্টার বিল্ডার* এর অনুবাদ *মহাস্থপতি*, *গোষ্ট* এর অনুবাদ *প্রেতাত্মা*, জন গ্যাব্যিয়েল বর্কম্যান, হেডডা গ্যাবলার, রস মার্সহোম ইত্যাদির অনুবাদ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কৃত ইবসেনের *ওয়াইল্ড ডাক* এর অনুবাদ *বুনো হাঁস*, শওকত ওসমানের কৃত মলিয়েরের পাঁচটি নাটক, শাহাবুদ্দিন কৃত আন্তন শেখভের *থ্রি সিসটার্স* এর অনুবাদ *তিন বোন*, *দি সিগাল* এর অনুবাদ *শঙ্খচিল*, সিকানদার আবু জাফর কৃত *সিংগের নাটক*, ইসমাইল মোহাম্মদ কৃত *হাপ্‌তম্যানের তিনটি নাটক*, জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান অনূদিত জাঁ-পল সার্তের *দ্বাররুদ্ধ*, মহীউদ্দিন অনূদিত শীলারের ঐতিহাসিক নাটক, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কৃত ও নীলের *হেয়ারি এপ* এর অনুবাদ *জাম্বুবান*, আবুল ফজল কৃত গোগলের *দি গর্ভনমেন্ট ইন্সপেক্টর* এর অনুবাদ *ছদ্মবেশী*, আলী যাকেরের ভাবানুবাদ *তেল সংকট ও বিদগ্ধ রমণীকুল*, *দেওয়ান গাজীর কিসসা* ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাটকের উন্মেষযুগে যে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, এ যুগেও সে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বিশ্বের উন্নত নাট্যসৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের নাট্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করছে এবং এখানকার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে প্রেরণা দিচ্ছে। অনুবাদ নাটকগুলোর গুরুত্ব এভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেকেট, ইয়োনোস্কো, ব্রেখট, সার্ত এ্যালবি, মলিয়ের, মোলনার, শেক্সপিয়র প্রমুখ নাট্যকারগণের নাটক বাংলায় অনূদিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এ ধরনের অনুবাদ বা রূপান্তর বাংলাদেশের নাটকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুবাদ নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন-

> স্বাধীন দেশের নতুন চিন্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই অনূদিত রূপান্তরিত হয়েছে এসব নাটক। ...মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে জাগ্রত বাঙালির স্বাধীনতা চেতনার আন্তর প্রেরণায় এসব নাটক অনূদিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।[২৮]

বাংলাদেশের বাংলা নাটকের আজকের যে অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও গর্বের কথা ১৯৭১ সালের পরেই এর সূচনা ও ব্যাপ্তি। স্বাধীনতার-পূর্বে এদেশে মঞ্চায়িত নাটকগুলো রচনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক সমস্যা, প্রেম সংক্রান্ত বিষয় প্রাধান্য পেলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে নাট্যকর্মী ও দর্শকদের কাছে আগ্রহ দেখাদিল নতুন বিষয়। আগেকার নাটকের সাথে এই নতুন নাটকের প্রধান পার্থক্য হলো নাটকে এখন একটা সু স্পষ্ট বক্তব্য এল। বক্তব্য ছাড়া কোনো নাটক আজকের নাট্যকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। সে সূত্রেই বিষয় অনুসন্ধান চলে প্রাচীন ভারতের ভূগোল থেকে সুদূর পাশ্চাত্য অবধি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকাতে বেশ কয়েকটি নাট্যদল গড়ে ওঠে; এর প্রভাবও পড়ে দেশময়। স্থানীয় নাট্যমোদীদের আগ্রহে গ্রাম, শহর, থানা ও জেলা পর্যায়ে নাটকের একাধিক দল গঠিত হয়, প্রয়োজন পড়ে লিখিত নতুন নাটকের। এ রকম সার্বিক পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেন প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকারগণ, বয়সে যাঁরা প্রায় সবাই তরুণ। সেলিম আল দীন, কবীর আনোয়ার, আনোয়ার তালুকদার, এহসানউল্লাহ, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক, হাবিবুল হাসান, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ প্রমুখের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮) ছিলেন এঁদেরই একজন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবদুল্লাহ আল-মামুন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। নাট্যচর্চায় বাংলাদেশে তিনি নিজস্ব ভুবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর নাটক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর নাটকের

---

[২৮] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৮, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান প্রবণতা লক্ষ্যকরা যায় সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণে। তরুণ সমাজের অবক্ষয়ের কারণ সমূহের উন্মোচনে তিনি ছিলেন সতর্ক কারিগর। তাঁর অনেকগুলো নাটক স্বাধীনতা-উত্তরকালের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে রচিত। মুক্তিযুদ্ধ সংলগ্ন বছরগুলোর সমাজকে চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁর নাটকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক যুগে লক্ষ্য করা যায় এ সময়ে নাট্য রচনায় সাহিত্যের চেয়ে সমাজের বিভিন্ন সংস্কারের চেষ্টা বেশি করা হয়েছে । বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে সমৃদ্ধ ইতিহাস তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করেছে। চল্লিশের দশকের শেষার্ধে বাংলা নাটকে নতুনত্বের একটা সুস্পষ্ট ঢেউ লক্ষ করা গেল। ১৯৪৭ পূর্ব বাংলা নাট্য সাহিত্য চর্চা কলকাতাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য চর্চা ঢাকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাট্য সাহিত্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ‘‘সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে গণআন্দোলন এবং স্বাধীনতার বিষয়টি আমাদের নাট্য চেতনার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।’’[২৯]

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকারদের প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়, হওয়ার কথাই। যুদ্ধ তো কোনো সামান্য ঘটনা নয় আর মুক্তিযুদ্ধ তো যে কোনো জাতির জন্যই এক পরম পাওয়া। যা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নাটকের ইতিহাসে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। গ্রুপ থিয়েটার ভিত্তিক নাটক মঞ্চায়ন হওয়ার ফলে নাটক রচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সঙ্গে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বিদেশি নাটকের অনুবাদ প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের বাংলা নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা নাট্য সাহিত্য গতিশীল এবং সম্ভাবনাময়; এ ধারা বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের সাথে তালমিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

---

[২৯] কবীর চৌধুরী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অনন্যা, বইমেলা ২০০১, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ও মানস-দৃষ্টি

আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮) আমাদের সাংস্কৃতিক ভুবনের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আলোকে আমাদের এই ভুবন বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলাদেশের নাট্যজগতে আবদুল্লাহ আল-মামুন নিঃসন্দেহে অনন্য প্রতিভাবান নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। বাংলা নাট্যপ্রেমীরা প্রতিভাবান এই নাট্যকারকে স্মরণ করবে তাঁর নাট্যকর্মে, নাট্যনির্দেশনায় এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে। তিনি শুধু নাটক রচনাই করেননি, একই সাথে নির্দেশনা দিয়েছেন ও অভিনয় করেছেন। নাট্যজগতে আবদুল্লাহ আল-মামুন স্বয়ং সম্পূর্ণ এক অনন্য নাট্যকার। নাট্যজন আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটকের সবগুলো মাধ্যমে কাজ করে মূলত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। গণমাধ্যমের অঙ্গনে তাঁর সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। নাট্যকার হিসেবে তাঁর রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সার্বিক আনুগত্য, মানবিকতার জয় ঘোষণা, নিচু এলাকার শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, ক্ষমতালোভী স্বার্থপর সমাজপতিদের হাতে অসহায় নারীদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত এবং ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে একদিকে আমাদের সমাজের বিশ্বস্ত দর্পণ, অন্যদিকে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন শিল্পকর্ম, তাঁর অনেক নাটকের নামকরণের মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ধরা পড়ে। নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক এই তিন সত্তার চমৎকার সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে, বাংলা নাট্যচর্চায় যা হাতেগোনা। ''সৃজনশীলতায় তাঁর রয়েছে আরো অনেক পরিচয়। তিনি ছিলেন টিভি নাটক রচয়িতা, প্রযোজক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও চলচ্চিত্রকার। এর কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর অর্জন শীর্ষবিন্দু ছোঁয়া। বিশেষত টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর অবদান অনন্য।''[৩০]

[৩০] প্রদীপ দেওয়ানজী, 'স্বপ্নতাড়িত একজন', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ফেব্রুয়ারি ২০১১, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম পরিচয়, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত জীবন

আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৪২ সালের ১৩ জুলাই আমলাপাড়া, জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন (জন্ম সাল আসলে ১৯৪৩, কিন্তু সার্টিফিকেটে ১৯৪২ বলে সব জায়গাতে সেটাই লিপিবদ্ধ আছে)। পিতা জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল কুদ্দুস, মাতা ফাতেমা খাতুন। একটি আলোকিত পরিবারে জন্ম নেওয়ায় বাবার অভিভাবকত্বে লাভ করেন সুশিক্ষা। ছেলেবেলা থেকেই মনে প্রাণে কিছুটা প্রতিবাদী স্বভাবের হলেও ছাত্রহিসেবে ছিলেন মেধাবী। পিতার প্রতি অগাধ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস নিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। বিলাসিতার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না তাঁর জীবনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে পত্রপত্রিকায় খণ্ডকালীন চাকরি ও লেখালেখি করে বেশিরভাগ খরচ নিজেই চালিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি. এ (অনার্স) আর ১৯৬৪ সালে একই বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে এম. এ পাস করেন আবদুল্লাহ আল-মামুন।

সহধর্মিণী ফরিদা খাতুনকে ছাত্র বয়সে, ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন ভালোই চলছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালে অকালে পত্নী বিয়োগের পর অনেকটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। চারটি সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালনের জন্য একজন মাতা আর তাঁর নিজের শেষ বয়সের অবলম্বনরূপী দ্বিতীয় পাণিগ্রহণের উপদেশ বর্ষিত হতে থাকে বহুদিক থেকে। তাঁর স্পষ্ট জবাব : ''মাতৃহারা শিশুদের মায়ের অভাব পূরণে তাঁর চেয়ে বেশি যোগ্যতা ও মমতা আর কারও থাকতে পারে না।''[৩১] তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা দৃষ্টান্তমূলক সন্দেহ নেই। মাতৃহীনা সন্তানদের মা-বাবার আদর স্নেহে বড়ো ও প্রতিষ্ঠিত করে তিনি সফল হয়েছেন। অনেক লোক নিয়ে কাজ করলেও মানুষ হিসেবে ছিলেন নিভৃতচারী। সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান, সমাবেশ ইত্যাদি থেকে

[৩১] মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'নাটক জগতে ধূমকেতু', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সবসময় দূরে থাকতেন। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সে জন্য অনেকেই তাঁকে অসামাজিক মনে করতেন। কিন্তু মানুষটা ছিল এ রকমেরই। ফলে দুঃখ-কষ্টের কথা খুব কম লোকের কাছে বলতেন। মনে মনে কষ্ট পেতেন বেশি। ''অন্তর্মুখী মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর কাছের মানুষেরাই জানতে পারতেন তাঁর ব্যক্তি জীবনের দুঃখ-বেদনা, হতাশা-আশাভঙ্গের কথা।''[৩২] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন চাপা স্বভাবের মানুষ। কোথায় যেন তার যন্ত্রণা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা, দ্রোহ-দাহ ছিল। নাটকের কোনো চরিত্রের বাইরে তাঁর দুচোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখা যায় নি। তাঁর হৃদয়ের গভীরে ফোঁটা ফোঁটা যে রক্তক্ষরণ হয় সে খবর কেউ কেউ জানত। আসলে একজন লেখক, শিল্পী, নাট্যকারের অন্তরে যদি গভীর কোনো ক্ষত না থাকে, তাতে যদি বিন্দু বিন্দু রক্ত না জমে, তাহলে তিনি বোধহয় সত্যিকার শিল্পী, নাট্যকার, পরিচালক হতে পারেন না।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের অনেক নাটকেই একটি মায়ের চরিত্র আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর নাটকে মা কেবল স্নেহশীলা নন, প্রতিবাদী ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। আমাদের সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তিনি রচনা করেছেন এক চরিত্রের নাটক কোকিলারা। বাংলাদেশের নাট্য রচনা ও প্রযোজনার ইতিহাসে এ নাটকটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে। সমাজের নামে, ধর্মের নামে নারীরা কীভাবে নিগৃহীত হয়, তাই তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। বাংলাদেশে অবহেলিত নারীসমাজের ন্যায্য অধিকার আন্দোলনে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক স্ফুলিঙ্গ হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর নারীদের ভূমিকা নিয়ে রচনা করেছেন অনেক নাটক। *বিবিসাব*, *সুবচন নির্বাসনে*, *এখনও ক্রীতদাস*, *তোমরাই*, *মেহেরজান আরেকবার*, *তৃতীয় পুরুষ* ইত্যাদি নাটকে নারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠারদিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মাতৃভক্তির গভীরতা সম্পর্কে ফেরদৌসী মজুমদার একটি টেলিভিশন ইন্টারভিউতে সাবলীলভাবে উল্লেখ করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী মামুনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশসম উঁচু। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে

[৩২] রামেন্দু মজুমদার, 'নিবেদন', *আবদুল্লাহ আল-মামুন: সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেম ও জনসেবার নিঃস্বার্থ আদর্শের প্রণোদনা জাগিয়ে একটি অনাচারমুক্ত, সুস্থ, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নে তিনি অটল ছিলেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ছিল কর্মবহুল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কর্মক্ষম ছিলেন। শারীরিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। জীবনের প্রারম্ভে জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে তাঁর জীবন হয়ে পড়েছিল নিঃসঙ্গ, যে বয়সে মানুষ তাঁর সঙ্গীকে কাছে চায়, সে বয়সে তিনি ছিলেন বিপত্নীক। স্ত্রী ফরিদা বেশ কিছু বছর কঠিন অসুখে ভুগে ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন, তখন প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বলেছিলেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ? যাও, আমিও আসছি।' ২৪ বছর আগে প্রয়াত স্ত্রীর কবরেই ২০০৮ সালে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হৃদয়বান, সহানুভূতিশীল ও বন্ধুবৎসল।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

ষাটের দশকে অগ্নিগর্ভ আর রত্ন প্রসবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজেকে সম্পৃক্ত করেন অগ্নিঝরা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দুর্বার গণআন্দোলনে। শিক্ষাবিদ জনকের আদর্শে অনুপ্রাণিত আবদুল্লাহ আল-মামুন অন্য দশজন মেধাবী সহপাঠীর মতো সেন্ট্রাল সুপরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কাজকর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করতে চাননি। বরং সৃজনশীল লেখনী, শক্তিমান চরিত্র-চিত্রণ, অভিনয়, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের জনপ্রিয় মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী বক্তব্য উপস্থাপন করে তিনি একটি সুন্দর পৃথিবী বানাতে চেয়েছিলেন। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন তরুণ সাংবাদিক হিসেবে। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়ে 'দৈনিক সংবাদে' কলম ধরেছিলেন ক্ষুরধার শিল্প সমালোচক হিসেবে। ''সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম টেলিভিশন সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন করেন তিনি, তাহলে তো এই দেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতার জনক ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। যখন তিনি মাত্র ২১ বছরের তরুণ।''[৩৩]

সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলে ও সে জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তদানীন্তন পাকিস্তানে টেলিভিশন চলে এলো। সেখানেই ডাক পড়লো তাঁর। সূচনালগ্ন থেকেই নাট্যরচনার কাজটা করেছিলেন তিনি। টেলিভিশনের জন্য পাণ্ডুলিপিটা কেমন হবে, ডি.আই.টি ভবনের ছোট্ট স্টুডিওতে কী করে লাইভ অনুষ্ঠান হিসেবে নাটক করা যায় এসব ছিল বড় ভাবনার বিষয়। সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে গিয়ে কখনো কখনো সৃজনের দ্বার খুলে যায়। সেই সময়ে কিছু মেধাবী লোকের সমন্বয় ঘটেছিল পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রে। সৃজনশীল দৃশ্যপট নির্মাণ, কিছু তরুণ প্রকৌশলী, অভিনেতা, সব মিলিয়ে একটা তারুণ্যের চমৎকার সমাবেশ। তার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। তাঁর জীবনের চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু টেলিভিশন এবং সেটা মাস বছরের ব্যাপার নয়।

[৩৩] দিলদার হোসেন, 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৭তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বছরের পর বছর। টেলিভিশনে নাটক রচনা ও প্রযোজনায় একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করে ফেলেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করা গেল বড় কাজের প্রতি।

প্রাতিষ্ঠানিক পেশাতেও অসামান্য দক্ষতা ও নেতৃত্বের উদাহরণ রেখে গেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। কি টেলিভিশন কর্মকর্তা হিসেবে, কি জাতীয় গণমাধ্যমের মহাপরিচালক হিসেবে, কি শিল্পকলা একাডেমির প্রধান হিসেবে। টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে ১৯৬৬ সালে ঢুকেছিলেন টিভিতে প্রোগ্রাম প্রডিউসর হিসেবে, বিদায় নিয়েছিলেন ১৯৯১ সালে পরিচালক, ফিল্ম ও ভিডিও ইউনিট হিসেবে। বি.টি.ভি'র যাত্রালগ্ন থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত নানামাত্রিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। কর্মজীবনের শেষ কয়েকটি বছর কাটাতে হয়েছে টিভির বাইরে। টিভির বাইরে থাকলেও তাঁর অন্তরজুড়ে ছিল টিভির ছোট পর্দা আর মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের বড়পর্দা। বিলুপ্ত TEN ও বর্তমানের ATN চ্যানেলে উপদেষ্টা হয়েও কাজ করেছেন। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন। সর্বশেষ ২০০১ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর নেন। স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র মিডিয়া বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হয়ে অধ্যাপনা করেছেন। পেশাগত প্রশিক্ষণে তিনি ঢাকা প্রেসক্লাব থেকে ডেস্ক জার্নালিজমে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। নেদারল্যান্ডে টিভি প্রোগ্রাম প্রোডাকশন কোর্স, কুয়ালালামপুর টিভি ও রেডিও প্রোগাম এপ্রিসিয়েশন কোর্স, কুয়ালালামপুর সিনিয়র ব্রডকাস্টিং ম্যানেজমেন্ট কোর্স সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন।

১৯৭২ সালে দেশের অগ্রণী নাটকের দল 'থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে। আর আবদুল্লাহ আল-মামুন, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদারের অক্লান্ত এবং উদ্ভাবনী পরিশ্রমের ফসল হিসেবে। কবীর চৌধুরী ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ, আবদুল্লাহ আল-মামুন ছিলেন উপাধ্যক্ষ। তিনি দিল্লীর এনএসডির সিলেবাসের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের পাঠ্যক্রম তৈরি করেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন একজন সফল শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষক ছিলেন। সংগঠক-অভিনেতা সাইফুর রহমান মিরন লিখেছেন-

> আমি থিয়েটার স্কুলের ১ম ব্যাচের ছাত্র। আমার পরিষ্কার মনে আছে কোনো কোনো স্যারের ক্লাসের প্রতি আমাদের অনেকেরই অনাগ্রহ ছিল এবং ২/১ দিন কেউ কেউ ক্লাসেও অনুপস্থিত থেকেছিল। কিন্তু মামুন স্যারের ক্লাস! এ যেন এক বাড়তি আকর্ষণ। তিনি ক্লাসে অনাবশ্যক তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা করতেন কম। বাস্তব এবং প্রায়োগিক বিষয়গুলোকে প্রধান্য দিয়ে গল্পের ছলে এমন সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করতেন যেন মনেই হতো না ক্লাস করছি।[৩৪]

রামেন্দু মজুমদারের মতে, আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার নাট্যদলের মূল সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। থিয়েটারের আটত্রিশটি প্রযোজনার মধ্যে আবদুল্লাহ আল-মামুনেরই লেখা নাটক বিশটি। আঠারোটি মৌলিক, দুটি নাট্যরূপ। অন্য দুটি প্রযোজনার রচয়িতা অন্যরা হলেও তিনি নাটক দুটো পুনর্লিখন করে শেষ পর্যন্ত প্রায় নিজের নাটকই করতে বাধ্য হয়েছিলেন। থিয়েটার প্রযোজিত আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, সেনাপতি, এখনও ক্রীতদাস, তোমরাই, কোকিলারা, দ্যাশের মানুষ, স্পর্ধা, মেরাজ ফকিরের মা, তাহারা তখন, মেহেরজান আরেকবার, গোলাপবাগান ও জন্মদিন। তিনি সমসাময়িক নাটক লিখতে উৎসাহ বোধ করতেন। নাটক লিখতে তেমন সময় লাগত না। মঞ্চের জন্য দ্রুত নাটক লিখে ফেলতে পারতেন। বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও তারুণ্য তাঁর নাটকে বারে বারে এসেছে। থিয়েটারে আবদুল্লাহ আল-মামুন সব সময়ে প্রযোজনার শৈল্পিক দিক নিয়ে ভাবতেন। সাংগঠনিক দিকটা অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তবে দলে যখন সাংগঠনিক সঙ্কট হতো, তখন শক্ত হাতে হাল ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযোজনা দিয়ে দলে গতি ফিরিয়ে এনেছেন। ''আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এবং

---

[৩৪] সাইফুর রহমান মিরন, 'নাটকের কারিগর মামুন ভাই', *আবদুল্লাহ আল-মামুন: সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার লক্ষ্যে 'থিয়েটার স্কুলের' নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল'।''[৩৫]

অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে একটা জায়গায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির পার্থক্য খুব মোটাদাগে চোখে পড়ে। তিনি শুধু টিভি বা মঞ্চের জন্য নাটক লিখেই তৃপ্ত ছিলেন না, তিনি নাট্যকলাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় একাডেমিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে নিষ্ঠা আর শ্রম দিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। যখন অনেক নাট্যকার টিভি বা মঞ্চের জন্য পাণ্ডুলিপি রচনা করেই পরিতৃপ্ত, সেখানে আবদুল্লাহ আল-মামুনের একের পর এক নাটকের বই বেরুচ্ছে মুক্তধারা থেকে, সেটা আশির দশকের শুরুর দিকের কথা। নিরন্তর রচনা, পরিচালনা আর নাট্যবিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান এবং পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সক্রিয় ছিলেন তিনি। একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের কোর্স ডিজাইন করেছেন এবং শুরুর দিকে শিক্ষকতাও করেছিলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন সম্পর্কে বাংলাদেশ থেরাপিউটিক থিয়েটারের পথিকৃৎ, চট্টগ্রামের নাট্যকর্মী মোস্তফা কামাল যাত্রা লিখেছেন-

> নাট্যবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে সম্মান প্রথম বর্ষে বাংলাদেশের অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত 'এখন দুঃসময়' নাটকটি পাঠ্য ছিল। ১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারুকলা বিভাগের অন্যতম শাখা হিসেবে নাট্যকলায় সম্মান প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রথম বর্ষেই আমাদের বাংলাদেশের নাট্য পাঠ্যসূচির আওতায় 'এখন দুঃসময়' নাটকটি পড়তে হয়েছিল। 'এখন দুঃসময়' নাটকটি কেন পাঠ্যসূচিভুক্ত এমন এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক জিয়া হায়দার বলেছিলেন, 'মামুনের রচিত এই নাকটির প্রেক্ষাপট, দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে আমাদের জন্য অবধারিত অনুষঙ্গ। নাটকটিতে উল্লেখিত সংলাপ ও ভাষার ব্যবহার, নাটকীয়তার স্তর নাট্য শিক্ষার্থীদের জন্য নাট্যসাহিত্য ও প্রযোজনা মূল্য অনুধাবনের সহায়ক ও

[৩৫] কবীর চৌধুরী, 'বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবদুল্লাহ আল-মামুন', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৮তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্তমূলক। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তুলনামূলক নাট্য সাহিত্য হিসেবে এটি পাঠ্যক্রমভুক্ত করা হয়েছিল'।[৩৬]

আবদুল্লাহ আল-মামুনের রচিত নাটক সমূহের বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বৈচিত্র্য থাকার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিলেবাসের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা আধুনিক নাটক নির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রগতিশীল ছিলেন এবং রামেন্দু মজুমদারদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বলেই তাকে আওয়ামীপন্থী বিবেচনা করেছিল সরকার। ১৯৯১-তে যখন সরকার ক্ষমতায় এলো, তখন আওয়ামীপন্থী বিবেচনা করে তাঁকে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক করে টিভি থেকে নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই সবাই প্রত্যাশা করেছিল জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক করা হবে। কিন্তু টিভির অভ্যন্তরে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর টিভিতে ফেরার বিরোধিতা করে। তিনি যে টিভির সব জানেন, বোঝেন এটা তাদের পছন্দ ছিল না। তারা মহাপরিচালক হিসেবে এমন একজনকে চেয়েছিল, যিনি তাদের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে থাকবে। এ ঘটনায় আবদুল্লাহ আল-মামুন খুবই আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতি একটা প্রচণ্ড অভিমান জমা হয়েছিলো। অবসরে যাওয়ার পূর্বে এক কূট চক্রান্তে বিটিভির শীর্ষপদে থেকে তিনি সেবা দিতে পারেননি। সত্যিকার অর্থে জাতির জন্য এটা বড় লজ্জাকর।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতি দমন কমিশন মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনে, তার মধ্যে *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* নামে ১০ পর্বের এই ধারাবাহিক নির্মাণ করে টাকা আত্মসাৎ করার মামলাও ছিল। তাঁর সঙ্গে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে অভিযুক্ত করা হয়। পত্র-পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হলে

[৩৬] মোস্তফা কামাল যাত্রা, 'সমাজবিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসু শিল্পস্রষ্টা : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ আল-মামুন খুব মুষড়ে পড়েন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের বক্তব্য, আমার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমি কাজটি করেছি। এতে আমি দুর্নীতি কী করে করলাম! পরে অবশ্য প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং মামলাটি আর দায়ের করা হয়নি। কিন্তু যে কাজের জন্য আবদুল্লাহ আল-মামুনের পুরস্কৃত হবার কথা ছিল, তার জন্য কপালে জুটল তিরস্কার।

নাটক জীবনের কথা বলে, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকগুলো। জীবনের সত্যকে তিনি নাটকে উচ্চারিত করেছেন বড় সাহসের সাথে, অকুতোভয়ে। তাঁর রচিত নাটকে দরিদ্র, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের কথা বলা হয়েছে, নারীর বঞ্চিত জীবনের কথা বলা হয়েছে, ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে, যাদের লোভ এবং অত্যাচারে আমাদের দেশে নেমে এসেছে অন্ধকারের এক যুগ। সেই হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে একজন সাহসী যোদ্ধা বলা যায়। যিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের রচিত নাটক এবং চলচ্চিত্রে কখনোই আপোসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে ১৯৬৪ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয় আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাটক শপথ। এ প্রসঙ্গে কামাল লোহানী লিখেছেন-

> পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে সংস্কৃতি সংসদ যে নাটক ও গণসংগীত অনুষ্ঠান করবে, তার নাটকের দায়িত্ব পড়ল মামুনের এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পড়ল আ.ন.ম গোলাম মোস্তফার (একাত্তরে শহিদ) ওপর। মামুন রচনা করেন শপথ নাটকটি। পরিচালনাও তিনি করেছিলেন। এর চরিত্রগুলোর নাম ছিল- আহত, নিহত, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, পৃথিবী, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ইত্যাদি। প্রতীকধর্মী এ নাটকের মঞ্চায়ন হয়েছিল 'বাংলা একাডেমি'র বটগাছের পাশে বিশাল মঞ্চ তৈরি করে। দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে সামরিক শাসনামলে এমন রাজনৈতিক নাটক লেখা ও মঞ্চায়ন সত্যি খুব সাহসের ব্যাপার ছিল।[৩৭]

[৩৭] কামাল লোহানী, 'এক অনন্য আত্মবিশ্বাসী', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৭তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। রাজাকারের আলখাল্লায় ঢেকে গেছে স্বদেশের গৌরব। এ সময় তথাকথিত বহু দেশপ্রেমিককে দেখা গেছে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজাকারদের হাত শক্ত করতে কিন্তু বাংলাদেশে নাটকের জগতের কেউ মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। কারণ নাটকের মূলমন্ত্রই হচ্ছে সত্যকে আবিষ্কার করে সত্যের হাত ধরে পথ চলা। আবদুল্লাহ আল-মামুন ছিলেন তেমনি একজন নাট্যসৈনিক। সৃষ্টিশীল মানুষ মাত্রেই সাহসী হন। এ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুন একটু বেশি অগ্রসর এ জন্যে যে, আমলাতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে থেকেও আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা করেছেন। যে কোনো সরকারের আমলে নীতির সঙ্গে আপোস করেননি। বরং সরকারি অব্যবস্থাপনা, বৈরী সময়ের দুঃসহ জনজীবন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, পাকিস্তানপন্থিদের বিভিন্ন সেক্টরে বহাল, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অশুভ তৎপরতা, ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য এসব তিনি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, তাঁর নাটকের সংলাপে।

নাটক মঞ্চায়নে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের অযৌক্তিক আইনকানুন ও বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ ছিল তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। ঔপনিবেশিক আমলে দুটি কালাকানুন্নর কবলে '৭৪ সালে দেশে নাটক মঞ্চায়ন কিছুদিন বন্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আবদুল্লাহ আল-মামুন মুখোমুখি হলেন একদিন। বঙ্গবন্ধু নাটকের খবরাখবর জানতে চাইলে তিনি ইতস্তত না করে সরাসরি বলেই ফেললেন, আপনি তো নাটক বন্ধ করে দিয়েছেন-

> ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের সাথে আবদুল্লাহ আল-মামুন ও রামেন্দু মজুমদারের একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকারের ঘটনা ঘটে। মঞ্চ আইনের ঘৃণিত আবর্জনা সাফ করে একটি প্রগতিশীল, আলোকিত ও লোকধর্মী সংশোধন প্রণয়ন এবং একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ বিষয়ে দৃঢ়কণ্ঠ দাবি ওঠে, হয় ফলপ্রসূ আলোচনা।[৩৮]

[৩৮] মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'নাটক জগতের ধূমকেতু', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি বিশদভাবে জানতে পেরে বঙ্গবন্ধু তখন কোনো আমলার ওপর নির্ভর না করে নাট্যপ্রদর্শনীর পক্ষে রাষ্ট্রপতির নাট্যচর্চা আদেশ জারি করেন। ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সারের *সংশপ্তক* এর মতো বড় উপন্যাসের নাট্যরূপ দেয়া সহজ কাজ নয়, কিন্তু তিনি সাহসী নাবিকের মতোই ক্ষিপ্ত, প্রত্যয়ী। সেই দুরুহ কাজটি করতে গিয়ে একবার তিনি স্টুডিওতে অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলেন। রাতের পর রাত, কখনো সারারাত শুটিং চলে রামপুরার অসমাপ্ত ফ্লোরে তাইতো *সংশপ্তক* অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে। 'দর্শক, শ্রোতার পাশাপাশি অভিভূত হয়ে যান ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সার।'[৩৯]

বিশেষ করে যারা তাঁর মঞ্চ নাটক, টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখেছেন তারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, তিনি আসলেই একজন সংগ্রামী, বিপ্লবী নির্মাতা ছিলেন। যিনি এই ঘুণে ধরা সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। শিল্পী, নাট্যকার ও নির্মাতার কণ্ঠ রোধ করে যারা আজ্ঞাবহ সংস্কৃতিক ক্রীতদাসে পরিণত করতে চাইত। বিপক্ষ শক্তি হিসেবে তিনি তাঁর ক্ষুরধার কলম দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সাহসী ভূমিকার জন্যেই নাট্যমঞ্চের বাতিগুলো আবার জ্বলে উঠেছিল।

[৩৯] মামুনুর রশীদ, 'একদুরন্ত নাবিকের কথা', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যরচনা, অভিনয় ও নির্দেশনা

আবদুল্লাহ আল-মামুন মুনীর চৌধুরীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মুনীর চৌধুরীর রচনা ও নির্দেশনার ধরন দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই স্নেহভাজন হয়েছিলেন নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখের। ''সেলিম আল দীন-এর নাট্যসঙ্গী যেমন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ছিলেন তেমনি আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যসঙ্গী ছিলেন আমাদের রামেন্দু দা।''[৪০] বিটিভি পরিদর্শনে বঙ্গবন্ধু আবদুল্লাহ আল-মামুনকে কাছে টেনে স্নেহ ও আদর করেছিলেন পত্রিকায় এ ছবি ছাপা হয়েছিল। নাট্যকার হিসেবে সফলতার পাশাপাশি নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবেও সফল দক্ষ ও যোগ্য আবদুল্লাহ আল-মামুন। অভিনয়ে তিনি সত্যিকার অর্থে সব বয়সী মানুষের মন জয় করেছেন। মঞ্চে, টিভি পর্দা ও চলচ্চিত্রে যে চরিত্রে অভিনয় করতেন সেটা বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য তথা জীবন্ত হয়ে উঠতো। তাঁর বাচনভঙ্গি, অভিনয় সবকিছু দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে এক হয়ে যেতেন তার জন্য তাঁকে ঐ মানুষই মনে হতো। যাকে বলে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এই গুণের জন্য তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করতেন সে চরিত্রটাই সত্যি সত্যি পর্দায় বা স্টেজে জীবন্ত হয়ে উঠত।

১৯৫৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্কুল ছাত্র হিসেবে তিনি জামালপুরে রচনা ও **নির্দেশনা** দিয়েছিলেন *নিয়তির পরিহাস*। ১৬ বছর বয়সে আশেক মাহমুদ কলেজের ছাত্র হিসেবে রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন, *ঋতুরাজ* কাব্য নাটক। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ১৯ বছর বয়সে রচনা করলেন *বিন্দু বিন্দু রং* নামক নাটকটি। শৈশব-কৈশোরে নাটক ছাড়াও রেডিও, চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল তেমনি যৌবনে এসে টেলিভিশন মাধ্যমটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদ রিপোর্টার হিসেবে। *নিয়তির পরিহাস* লিখে ও **নির্দেশনা দিয়ে** যে প্রতিবাদী কলম ধরেছিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন,

[৪০] দিলদার হোসেন, 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর সে কৃতসংকল্প বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠে পরিণত হয়েছিল।

শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে তিনি ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে নাটকের অনুষ্ঠানমালা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কসমপলিটন আবাসিক হল ঢাকা হলের নাট্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে হলের বার্ষিক নাটক হিসেবে অধ্যক্ষ আজিমউদ্দিন আহমদের *মা* নাটকের নির্দেশনা দিয়ে এবং এর একটি প্রধান চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর থেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। *ক্রীতদাসের হাসি*, *চোখের বালি*, *গৃহদাহ* সহ অনেক নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের অভিনয় ছিল সত্যিই অসাধারণ। ডাকসু ও ঢাকা হলের নাটক *লবণাক্ত*, *যদি এমন হত*, *মা*, *মায়াবী প্রহর*, *অনেক তারার হাতছানি*, *প্রচ্ছদপট* এসব নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৬৩ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী গঠন করা হয়, তখন আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শওকত ওসমানের উপন্যাসে রামেন্দু মজুমদারের দেওয়া নাট্যরূপ *ক্রীতদাসের হাসি* মঞ্চস্থ হয় কার্জন হলে। নাজমুল হুদার নির্দেশনায় নাটকটির অন্যতম প্রধান চরিত্র তাতারীর ভূমিকায় আবদুল্লাহ আল-মামুন অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন কুরসি ও বিবিসাব নামে দুটি পথনাটক রচনা করেছিলেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় নাটক দুটি অভিনীত হয়েছে। তিনি যেহেতু তখন সরকারি চাকরি করতেন, তাই লেখক হিসেবে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন তীরন্দাজ। তিনি দুঃখ করে বলতেন, আমার নাটক শহিদ মিনারে অভিনীত হচ্ছে, আমি অভিনয় করতে পারছি না, আমার রচনার কথা বলা যাচ্ছে না। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছি। সরকারি এ বিড়ম্বনা অনেক সময়েই তাঁকে পোহাতে হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* মঞ্চস্থ করেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। তখনকার দিনে এরকম একটি নিরীক্ষামূলক নাটক সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি সেই কঠিন কাজটিই

Dhaka University Institutional Repository

বড় অনায়াসে সম্পন্ন করেছিলেন। কাব্যনাটককে কীভাবে মঞ্চে অভিনয় উপযোগী করে তোলা যায় আবদুল্লাহ আল-মামুনের তার স্বাক্ষর রেখেছে এ প্রযোজনায়। নাটকটির যখন মহড়া শুরু করা হয়, তখন কেবলই কবিতার সুর এসে যেত। তিনি তা পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে কিছু সংলাপে ছন্দ আনলো, তালবাদ্য সহযোগে। পাণ্ডুলিপিতে গ্রামবাসী, যুবক, তরুণ, এদের সংলাপ ভাগ করে চরিত্রগুলো আলাদা করলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের নির্দেশনায় *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্যের ভেতর দিয়েই নাটকের জগতে সৈয়দ শামসুল হকের প্রবেশ। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় সম্ভবত আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ওপর শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম। আবদুল্লাহ আল-মামুন অভিনীত মঞ্চনাটক-পঞ্জি :

ক্রমিক নং	নাটক	নাট্যকার	চরিত্র	নির্দেশক	প্রযোজনা	প্রথম মঞ্চায়ন	মোট মঞ্চায়ন
১	নিয়তির পরিহাস	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বাবা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	জামালপুর গভ. হাইস্কুল	১৯৫৭ জামালপুর গভ. হাইস্কুল	১
২	(লেখকের মনে নেই)	আবদুল্লাহ আল-মামুন	নায়িকার বাবা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	ঢাকা কলেজ উত্তর ছাত্রাবাস	১৯৫৯ ঢাকা কলেজ	১
৩	লবণাক্ত	নিশিকান্ত বসুরায়	ব্যবসায়ীর বড় ভাই	নাজমুল হুদা বাচ্চু	ডাকসু	১৯৬০ কার্জন হল	২
৪	যদি এমন হতো	নুরুল মোমেন	ব্যারিষ্টার	নাজমুল হুদা বাচ্চু	ডাকসু	১৯৬১ কার্জন হল	২
৫	বিন্দু বিন্দু রং	আবদুল্লাহ আল-মামুন	প্রতিবাদী শিক্ষক	নাজমুল হুদা বাচ্চু	কালের পুতুল	১৯৬২ ইউসিস	২

Dhaka University Institutional Repository

					নাট্যসংস্থা	মিলনায়তন	
৬	মা	অধ্যক্ষ আজিমুদ্দিন আহমেদ	বাবা	কেরামত মওলা	ঢাকা হল, ঢাবি	১৯৬৩ কার্জন হল	২
৭	ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান, রামেন্দু মজুমদার	তাতারি	নাজমুল হুদা বাচ্চু	ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	১৯৬৩ কার্জন হল	৪
৮	শপথ	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বিশ্ব	আবদুল্লাহ আল-মামুন	সংস্কৃতি সংসদ	১৯৬৪ বাংলা একাডেমি	৪
৯	ক্রসরোডে ক্রসফায়ার	আবদুল্লাহ আল-মামুন	মোটকা চৌধুরী	আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম	আমরা ক'জনা	১৯৭৩ বাংলা একাডেমি	১
১০	অনেক তারার হাতছানি	আসকার ইবনে শাইখ	নায়ক	নাজমুল হুদা বাচ্চু	বাংলা একাডেমি	১৯৬৭ বাংলা একাডেমি	২
১১	বহিপীর	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	যুবক	আসকার ইবনে শাইখ	বাংলা একাডেমি	১৯৬৮ বাংলা একাডেমি	২
১২	কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অন্যতম সেনাপতি	মুনীর চৌধুরী	বাংলা একাডেমি	১৯৬৮ বাংলা একাডেমি	২
১৩	কবর	মুনীর চৌধুরী	নেতা	রামেন্দু মজুমদার	বাংলা একাডেমি	১৯৭২ বাংলা	৪

Dhaka University Institutional Repository

						একাডেমি	
১৪	উজান পবন	আবদুল্লাহ আল-মামুন	চাষী	আবদুল্লাহ আল-মামুন	ক্রান্তি	১৯৭২ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট	২
১৫	সুবচন নির্বাসনে	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বস/বাবা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	১৯ এপ্রিল ১৯৭৪ মহিলা সমিতি	২৪
১৬	এখন দুঃসময়	আবদুল্লাহ আল-মামুন	ব্যাপারী	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মহিলা সমিতি	২৪
১৭	চারদিকে যুদ্ধ	কাহিনী- প্রফুল্ল রায়, নাট্যরূপ- আবদুল্লাহ আল-মামুন	সানু	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২০ জানুয়ারি ১৯৭৬ মহিলা সমিতি	২৩
১৮	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক	মাতবর	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২৫ নভেম্বর ১৯৭৬ মহিলা সমিতি	১০৫
১৯	দুই বোন	কাহিনী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ- মমতাজ	নালু দা’	ফেরদৌসী মজুমদার	থিয়েটার	৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ মহিলা সমিতি	১১০

Dhaka University Institutional Repository

		উদদীন আহমদ					
২০	সেনাপতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন	আব্বাস আলী তালুকদার	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২ মার্চ ১৯৭৯ মহিলা সমিতি	৮৬
২১	ওথেলো	মূল- উইলিয়াম শেক্সপীয়র, অনুবাদ- মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী	ইয়াগো	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ মহিলা সমিতি	৪৯
২২	অরক্ষিত মতিঝিল	আবদুল্লাহ আল-মামুন	শিহাব	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ বাংলা একাডেমি	১
২৩	পুরানো পালা	মূল- আরবুঝভ, রূপান্তর- আনিসুজ্জামান	নায়ক	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	১০ নভেম্বর ১৯৮২ শিল্পকলা একাডেমি	১
২৪	এখানে এখন	সৈয়দ শামসুল হক	রফিক	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	৩০ ডিসেম্বর	২৮

Dhaka University Institutional Repository

						১৯৮২ মহিলা সমিতি	
২৫	এখনও ক্রীতদাস	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বাক্কা মিয়া	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ মহিলা সমিতি	১০১
২৬	ঘরে-বাইরে	কাহিনী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ- আবদুল্লাহ আল-মামুন	নিখিলেশ	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ গাইড হাউস	৫২
২৭	যুদ্ধ এবং যুদ্ধ	সৈয়দ শামসুল হক	বাবা	তারিক আনাম খান	থিয়েটার	১৩ আগস্ট ১৯৮৬ মহিলা সমিতি	৫০
২৮	তোমরাই	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বাবা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	১৫ জুলাই ১৯৮৭ মহিলা সমিতি	১০৮
২৯	কুরসী	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বাউল	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮	৫

Dhaka University Institutional Repository

						কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার	
৩০	দ্যাশের মানুষ	আবদুল্লাহ আল-মামুন	রাজনৈতিক নেতা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	৭ মে ১৯৯১ গাইড হাউস	৩২
৩১	আন্তিগোনে	মূল জঁ আনুঈ, অনুবাদ- খায়রুল আলম সবুজ	ক্রেয়ন (২টি প্রদর্শনী)	খায়রুল আলম সবুজ	থিয়েটার	১৯ জুন ১৯৯২ গাইড হাউস	১৩
৩২	স্পর্ধা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	বাবা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২৭ নভেম্বর ১৯৯৩ গাইড হাউস	৪৪
৩৩	কৃষ্ণকান্তের উইল	উপন্যাস- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , নাট্যরূপ- আবদুল্লাহ আল-মামুন	গোবিন্দ লাল	ফেরদৌসী মজুমদার	থিয়েটার	৬ নভেম্বর ১৯৯৪ মহিলা সমিতি	১৫
৩৪	মেরাজ ফকিরের মা	আবদুল্লাহ আল-মামুন	গেদা ফকির	আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	২০ মে ১৯৯৫ মহিলা	১০৯

Dhaka University Institutional Repository

						সমিতি	
৩৫	মেহেরজান আরেকবার	আবদুল্লাহ আল-মামুন	হাজী সাহেব	ফেরদৌসী মজুমদার	থিয়েটার	১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পাবলিক লাইব্রেরি	২৯
৩৬	ছয় বেহারার পালকি	জগলুল আলম	বাবা	জগলুল আলম, মারুফ কবির ও ত্রপা মজুমদার	থিয়েটার	১৬ জুন, ২০০০ গাইড হাউস	১৯
৩৭	গোলাপ বাগান	আবদুল্লাহ আল-মামুন		আবদুল্লাহ আল-মামুন	থিয়েটার	১৬ জানুয়ারি, ২০০২ মহিলা সমিতি	১৮
৩৮	মাধবী	ভীষ্ম সাহানী	যযাতি	রামেন্দু মজুমদার	থিয়েটার	৩ নভেম্বর ২০০৩ মহিলা সমিতি	

৪১

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের যে জনপ্রিয়তা, তার অন্যতম প্রধান কারিগর আবদুল্লাহ আল-মামুন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মঞ্চ নাটককে জনপ্রিয় করার পেছনে কয়েকটি নাট্যদলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও আমি মনে করি আবদুল্লাহ আল-মামুনের ব্যক্তিগত অবদান ও ভূমিকা সবার শীর্ষে। বিষয় নির্বাচনে

[৪১] ফরহাদ জামান পলাশ (সংকলন) : *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সবসময় তাঁর চারপাশে তাকিয়েছিলেন। সমসাময়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় শিল্প সমৃদ্ধভাবে তিনি তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য সমসাময়িক সমস্যা ও জীবন নিয়ে উপভোগ্য নাটক রচনা, নাটক প্রযোজনা, সেই সঙ্গে তাঁর নিজের ও দলের অন্যদের দক্ষ অভিনয়ের কারণে সত্তর দশকে মঞ্চনাটক বা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বেগবান হয়েছিল। বাংলাদেশে খুব কম নাট্যদলই খুঁজে পাওয়া যাবে, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে, যারা আবদুল্লাহ আল-মামুনের কোনো নাটক মঞ্চায়ন করেনি। মঞ্চ নাটককে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নাট্যরস পিপাসু দর্শকের কাছাকাছি। তিনি যেহেতু নিজে দক্ষ নির্দেশক ও অভিনেতা ছিলেন, নাটক লেখার সময় মঞ্চায়নের ভাবনাটা সবসময় মনে রাখতেন। সে কারণেই তাঁর বেশিরভাগ নাটক হয়েছে মঞ্চ সফল। তাঁর নাটকের একটা বড় গুণ হচ্ছে, প্রথম পাঁচ মিনিটেই এমন ঘটনার অবতারণা করা হয় যার ফলে দর্শকের কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং নাটকটি মঞ্চ সফল হয়।

মঞ্চ নাটক রচনায় বিদেশি নট্যকার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। জার্মান নাট্যকার ক্রোৎস অনুসরণে একটি সংলাপবিহীন নাটক করেছিলেন *একা*। সেখানে সংলাপের বদলে শিল্পীর মুভমেন্টের বর্ণনা আছে, তাতেই নাটকের গল্পটি দর্শকদের কাছে ধরা দেয়। নাটকটির শেষে ছিল, জীবনের গতানুগতিকতা ও হতাশা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বিয়ের পোশাক পরে আত্মহত্যা করে। সে জন্য আবদুল্লাহ আল-মামুন ঠিক করলেন, নাটকের শেষে অভিনয়শিল্পী ফেরদৌসী মজুমদার দর্শকদের অভিবাদন করে ছোট্ট একটা বক্তব্য দেবে যাতে বলবে যে, নাটকে যা ঘটেছে সেটা কিন্তু জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ নয়, ইত্যাদি। নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের সময় তিনি সতর্ক থেকেছেন দর্শকদের কাছে যাতে ভুল বার্তা না যায়। আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত মঞ্চনাটক পঞ্জি ছক আকারে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	নাটক/নাট্যরূপ	প্রকাশকাল	প্রকাশক	মঞ্চ প্রযোজনা	প্রথম মঞ্চায়ন	নির্দেশনা

Dhaka University Institutional Repository

১	নিয়তির পরিহাস			জামাল পুর গভ. হাইস্কুল	১৯৫৭ জামাল পুর গভ. হাইস্কুল	আবদুল্লাহ আল-মামুন
২				ঢাকা কলেজ উত্তর ছাত্রাবাস	১৯৫৯ ঢাকা কলেজ উত্তর ছাত্রাবাস	আবদুল্লাহ আল-মামুন
৩	বিন্দু বিন্দু রং		কালের পুতুল নাট্যসংস্থা	১৯৬২ ইউনিস মিলনায়তন		নাজমুল হুদা বাচ্চু
৪	ডা. ফস্টাস (অনুবাদ) মূল-ক্রিস্টোফার মার্লো	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩	থিয়েটার পত্রিকা প্রথমবর্ষ ২য় সংখ্যা			
৫	সুবচন নির্বাসনে	ডিসেম্বর ১৯৭৪	মুক্তধারা	থিয়েটার	১৯ এপ্রিল ১৯৭৪ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
৬	এখন দুঃসময়	সেপ্টেম্বর ১৯৭৫	মুক্তধারা	থিয়েটার	সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন

Dhaka University Institutional Repository

৭	এবার ধরা দাও	সেপ্টেম্বর ১৯৭৭	মুক্তধারা	অবসর	১৯৭৭ শিল্পকলা একাডেমি	সৈয়দ সিদ্দিকা হোসেন
৮	শপথ	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	মুক্তধারা	সংস্কৃতি সংসদ	১৯৬৪ বাংলা একাডেমি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
৯	সেনাপতি	জুলাই ১৯৮০	মুক্তধারা	সংস্কৃতি সংসদ	২ মার্চ ১৯৭৯ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১০	অরক্ষিত মতিঝিল	জুলাই ১৯৮০	মুক্তধারা	সংস্কৃতি সংসদ	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১১	ক্রসরোডে ক্রসফায়ার	সেপ্টেম্বর ১৯৮১	মুক্তধারা	আমরা ক'জনা	১৯৭৩ বাংলা একাডেমি	আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম
১২	শাহজাদীর কালো নেকাব	আগস্ট ১৯৮৪	মুক্তধারা			
১৩	চারদিকে যুদ্ধ	আগস্ট ১৯৮৩	মুক্তধারা	থিয়েটার	২০ জানুয়ারি ১৯৭৬ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১৪	আয়নায় বন্ধুর মুখ	জুন ১৯৮৩	মুক্তধারা	থিয়েটার-এর তাহারা তখন	২৭ নভেম্বর ১৯৯৬ পাবলিক	ফেরদৌসী মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

					লাইব্রেরি	
১৫	এখনও ক্রীতদাস	আগস্ট ১৯৮৪	মুক্তধারা	থিয়েটার	২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১৬	ঘরে-বাইরে	মার্চ ১৯৮৬	থিয়েটার পত্রিকা দ্বাদশ-বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা	থিয়েটার	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ গাইড হাউস	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১৭	তোমরাই	জানুয়ারি ১৯৮৮	মুক্তধারা	থিয়েটার	১৫ জুলাই ১৯৮৭ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
১৮	দূরপাল্লা	নভেম্বর ১৯৮৮	কথন প্রকাশনী			
১৯	তৃতীয় পুরুষ	আগস্ট ১৯৮৮	কথন প্রকাশনী			
২০	আমাদের সন্তানেরা	সেপ্টেম্বর ১৯৮৮	কথন প্রকাশনী	থিয়েটার স্কুল	২ অক্টোবর ১৯৯১ গাইড হাউস	কামরুজ্জামান রুনু
২১	কোকিলারা	ফেব্রুয়ারি	মুক্তধারা	থিয়েটার	১৯	আবদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

		১৯৯০			জানুয়ারি ১৯৮৯ গাইড হাউস	আল-মামুন
২২	তিনটি পথ নাটক : উজান পবন/বিবসাব/কুরসী	ফেব্রুয়ারি ১৯৯১	মুক্তধারা	উজান পবন-ক্রান্তি বিবিসাব ও কুরসী-থিয়েটার	উজান পবন-১৯৭২ ইঞ্জিঃ ইনস্টি, বিবিসাব-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, কুরসী-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার	আবদুল্লাহ আল-মামুন
২৩	দ্যাশের মানুষ	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩	মুক্তধারা	থিয়েটার	৭ মে ১৯৯১ গাইড হাউস	আবদুল্লাহ আল-মামুন

Dhaka University Institutional Repository

২৪	মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র	জুন ১৯৯৩	অনন্যা			
২৫	একা (অনুবাদ)	অক্টোবর ১৯৯৫	থিয়েটার পত্রিকা উনবিংশ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা	থিয়েটার	১৯৯৪ জার্মান কালচারাল সেন্টার	আবদুল্লাহ আল-মামুন
২৬	স্পর্ধা	এপ্রিল ১৯৯৬	সাহিত্য প্রকাশ	থিয়েটার	২৭ নভেম্বর ১৯৯৩ গাইড হাউস	আবদুল্লাহ আল-মামুন
২৭	মেরাজ ফকিরের মা	এপ্রিল ১৯৯৭	সাহিত্য প্রকাশ	থিয়েটার	২০ মে ১৯৯৫ মহিলা সমিতি	আবদুল্লাহ আল-মামুন
২৮	কৃষ্ণকান্তের উইল	সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	মুক্তধারা	থিয়েটার	৬ নভেম্বর ১৯৯৪ মহিলা সমিতি	ফেরদৌসী মজুমদার
২৯	মাইক মাস্টার	সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	থিয়েটার পত্রিকা বিংশতি বর্ষপূর্তি	থিয়েটার	২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ শিল্পকলা একাডেমি	ফরহাদ জামান পলাশ

Dhaka University Institutional Repository

			সংখ্যা			
৩০	মেহেরজান আরেকবার	ডিসেম্বর ১৯৯৮	থিয়েটার পত্রিকা এক বিংশতি বর্ষ-১-২ সংখ্যা	থিয়েটার	১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পাবলিক লাইব্রেরি	ফেরদৌসী মজুমদার
৩১	জন্মদিন	জুলাই ২০০৬	থিয়েটার পত্রিকার ৩৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা	থিয়েটার		আবদুল্লাহ আল-মামুন

৪২

মঞ্চের পাশাপাশি তাঁর দ্বিতীয় সংস্কার ছিল টেলিভিশনে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটক এক অর্থে তাঁর হাত ধরেই পেশাদারিত্ব অর্জন করেছে, উৎকর্ষ লাভ করেছে। টিভির জন্যে তিনি দ্রুততার সাথে অনেক নাটক রচনা করেছেন। নাট্য প্রযোজনায় তিনি যে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, টিভিতে তাঁর হাত ধরে অসংখ্য শিল্পী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক টিভি প্রযোজনার মধ্যে *সংশপ্তক* (২৬ পর্ব), *ঘরোয়া* (৫২ পর্ব), *আমি তুমি সে* (২৬ পর্ব), পাথর সময় (১৩ পর্ব), *জোয়ার ভাটা* (২০০ পর্ব), *শীর্ষবিন্দু* (৭ পর্ব), *জীবন ছবি* (১৪ পর্ব), *উত্তারাধিকার* (১৪ পর্ব), *শেষ বিকেলের মেয়ে* (৭ পর্ব), বাবা (২০০ পর্ব), *এক জনমে* (২৮৭ পর্ব) উল্লেখযোগ্য। রেডিওতে আবদুল্লাহ আল-মামুনের লেখা প্রথম নাটক *মেকআপ*। সেটির প্রযোজক ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী ।

[৪২] ফরহাদ জামান পলাশ (সংকলন) : *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২১১

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রা ও চলচ্চিত্র শিল্প

বাংলাদেশে বাংলা নাটকের সেনাপতি আবদুল্লাহ আল-মামুন যাত্রার সংকট মোকাবেলায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন একাধিকবার। এখানে বিশেষভাবে একটি কথা উল্লেখ করতে হয় যে, বহুকাল পর্যন্ত গ্রামীণ যাত্রা পালা শহুরে শিক্ষিত সমাজের বাইরে ছিল। ভদ্রলোকের মধ্যে 'যাত্রা করে ফাতরা লোকে'- এরকম একটি প্রবচন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই হীন মানসিকতা এখনও কিছু কিছু মহলে দেখা যায়। তবে স্বাধীনতার পর যাত্রাশিল্পের বড় অর্জন, নগর সংস্কৃতির সঙ্গে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলা। ফলে আমরা দেখেছি প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান, নির্মল সেন, কামাল লোহানী, রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, ম.হামিদ প্রমুখ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা বিভিন্নভাবে যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যাত্রার আন্দোলনে মিছিলে শ্লোগান দিয়েছেন। নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা আবদুল্লাহ আল-মামুন কখনও যাত্রার সভা সমাবেশে শ্লোগান দেননি। তবে তিনি যাত্রা নিয়ে ভেবেছেন, যাত্রার জন্যে শ্রম দিয়েছেন প্রশাসনিক পর্যায়ে।

সরকারি গণ্ডির সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যাত্রার জন্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। একবার যাত্রাশিল্পে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ২৬ জন বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে। তিনি যখন ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিচ্ছেন, তখন রামেন্দু মজুমদার পরিহাসছলেই বলে উঠলেন, ''আপনি একজন সরকারি চাকুরে। যাত্রার বিবৃতিতে সই দিলে আবার অসুবিধা না হয়।' মামুন হাসতে হাসতে জবাব দেন-'যাত্রার একটি কাগজে সই করার দায়ে চাকরি যদি চলে যায়, তাহলে এদেশের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা কীভাবে সম্ভব'।''[৪৩]

[৪৩] মিলন কান্তি দে, 'যাত্রার সংকটকালে একজন আবদুল্লাহ আল-মামুন', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাশিল্পে আরও অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি আছে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে ঘিরে। প্রকৃতই তিনি ছিলেন যাত্রাঅন্তপ্রাণ। যাত্রা আলোকিত হোক নতুন পথে, নতুন চেতনায় এই স্বপ্ন দেখতেন আবদুল্লাহ আল-মামুন । মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধীরা বাঙালি সংস্কৃতিকে ভয় পায়। কারণ এই মাধ্যমটিতে ওদের নগ্ন চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়। এসব ক্ষেত্রে যাত্রার অবদান আছে। যাত্রার শাণিত সংলাপ দেশদ্রোহী, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পরাজয় ঘোষণা করে। সেই জন্যেই বাংলাদেশে বাঙালির এই নিজস্ব শিল্পটি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। 'গণজাগরণের মতো আন্দোলন না হলে ঐতিহ্যবাহী যাত্রার মুক্তি আসবে না' এই উচ্চারণ ছিল বাংলা নাটকের অন্যতম সেনানায়ক আবদুল্লাহ আল-মামুনের। কথাগুলো বলেছিলেন ১৯৯৩ সালে। যাত্রার তখন নিষেধাজ্ঞা। যাত্রা ও নাটকের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুনের এ ধরনের সাহসী দৃষ্টান্ত প্রশংসনীয়।

চলচ্চিত্রকার হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আমরা পেয়েছি শুধু স্রষ্টাই নয়, দুর্মর সাহসী এক যোদ্ধা হিসেবে। বাংলাদেশের অধঃপতিত চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমকে তিনি বিকল্পধারায় নয়, বাণিজ্যিক ধারাতেই সবল ও সৃষ্টিশীল মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নির্মাণ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু চলচ্চিত্র। রোদে পুড়ে জলে ভিজে জীবনীশক্তির সবটুকু, এমনকি তারও অতিরিক্ত তিনি ঢেলে দিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। প্রায় একা হাতে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ধস তিনি রুখেছেন এবং কাঁধে ঠেলে তুলে ধরেছেন। কর্ম জীবনের বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে দিতে হয়েছিলো বলে চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। নির্মাতাকামী দলের একজন সদস্য হিসেবে ১৯৭৩ সালে ছদ্মনামে *অঙ্গিকার* চলচ্চিত্রটি নির্মাণের মাধ্যমে তাঁর অভিষেক হয় চলচ্চিত্রকার হিসেবে।

শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৮ সালে নির্মাণ করেন *সারেং বৌ* চলচ্চিত্রটি। অসাধারণ দক্ষতায় উপন্যাসটিকে চিত্রায়িত করেছেন বলে *সারেং বৌ* চলচ্চিত্রটি হয়ে উঠেছে একটি অসাধারণ চলচ্চিত্র। উপন্যাসটির চরিত্রগুলোর পাশাপাশি পরিবেশ হয়ে উঠেছে জীবন্ত। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ, সমালোচক থেকে শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে সাধারণ হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছে চলচ্চিত্রটি। বিপুল সাড়া ফেলেছিল এটি। বিরাট সাফল্যও পায় তাঁর সৃষ্টি। দৈনিক বাংলার নোয়াখালীস্থ স্টাফ রিপোর্টার প্রয়াত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কামালউদ্দিন আহমেদ তাঁর উপন্যাস *দরিয়া পাড়ের দৌলতি* আবদুল্লাহ আল-মামুনের মতো যোগ্য চিত্রনাট্যকার পরিচালকের হাতে পরার পর তিনি খুশি হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর, তিনি এ ছবির কাজ শুরু হবার আগেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ আল-মামুন ছবিটি প্রায় শেষ করে এনেও শেষ দেখে যেতে পারলেন না, তাঁর জীবনের শেষ বড় কাজটির। এই ছবিটি নিয়ে ঔপন্যাসিকের মতো চিত্রনাট্যকার পরিচালকও ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী, কিন্তু অপূর্ণই রয়ে গেল সেই সাফল্যের স্বীকৃতি পাওয়া। স্বীকৃতি যখন আসছে তখন তিনি সকল চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে ১৯৮০ সালে *সখি তুমি কার*, *এখনই সময়*, ১৯৮২ সালে *মন মানে না*, ১৯৮৮ সালে *দুই জীবন*, ১৯৯৩ সালে *জনম দুঃখী*, ১৯৯৫ সালে *দমকা*, ২০০১ সালে *বিহঙ্গ* চলচ্চিত্র উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নতুন চলচ্চিত্র *দরিয়া পাড়ের দৌলতি* প্রায় শেষ করে গেছেন যা এখন মুক্তি পেয়েছে। অসমাপ্ত রয়েছে দুই *বিয়াইয়ের কীর্তি*, *ফেরদৌসী মজুমদার : জীবন ও অভিনয়* প্রামাণ্য চলচ্চিত্র এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে *মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু* প্রামাণ্য চিত্রগুলো তিনি সাফল্যের সাথে নির্মাণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপ নির্মাণ ও শিল্পী তৈরির দক্ষতা

আবদুল্লাহ আল-মামুনের সময়ে দর্শকদের নাড়ির গতিবিধি তাঁর মতো করে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই যেসব কথা বলতে গিয়ে বা যেসব অন্ধকার জায়গায় আলো ফেলতে গিয়ে অন্য নাট্যকাররা দর্শকদের কাছে রীতিমতো বোঝা হয়ে উঠেছিলেন, সেখানে তিনি হাঁটাচলা করেছেন অনায়াসে। এই হাঁটাচলায় তাঁর অন্যতম অবলম্বন ছিল অসাধারণ সংলাপ। তাঁর নাটকে প্রায়শ বাস্তবধর্মী সংলাপ লক্ষণীয়। তিনি সহজেই একটি সাধারণ কথাকে অসাধারণ করে তুলতে পারতেন। দর্শকরা শুধু নাটক নয়, তাঁর সংলাপও আলাদাভাবে উপভোগ করত। সমসময়ের কাছে দায়বদ্ধ বিষয়, আটপৌরে বুনন এবং চমৎকার ও তীক্ষ্ণ সংলাপ এই তিনের সমন্বয়ে তাঁর প্রতিটি নাটক যেকোনো শ্রেণির দর্শককে মুগ্ধ করে রাখত। বাংলাদেশের নাটকের আজ যে সম্মানজনক অবস্থান তা আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ আরো কয়েকজনের সৃষ্টিশীলতাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকের শেষ সংলাপ খুব অর্থবহ। দর্শক যেন বাড়ি ফিরে যেতে যেতে নাটকটির মূল ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়, একটু চিন্তা করে সেই উদ্দেশ্য সাধনেই বক্তৃতাধর্মী সংলাপ সংযোজন করতেন তিনি। ''সংলাপকে মামুন কখনো নাটকের ঘটনা-খণ্ডকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে, কখনো নাটকস্থ প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বকে তীক্ষ্ণ করার জন্য, আবার কখনো চরিত্রবর্গের মনোতলকে উদ্ভাসিত করার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন।''[৪৪]

নাটকের সাহিত্যমূল্য বা শিল্পমূল্য সম্পর্কে সব সময় সজাগ ছিলেন তিনি। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নাটক লিখলেও তা কখনো শ্লোগান হয়নি, যা অনেক সময় হয়ে থাকে। তাঁর বহু নাটকের বহু সংলাপ নাট্যশিল্পীদের কাছে উদ্ধৃতির মর্যাদা পেয়েছে। সংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। তাঁর সাথে যারা নাটকে কাজ করেছেন এখনো কথায় কথায় তাঁর নাটকের সংলাপ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন অনায়াসে। আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজেই বলেছেন যে, সংলাপ-রচনায় তিনি মুনীর চৌধুরীকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। নাটকের শেষ সংলাপগুলোর মধ্যে নাটকের মূল বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। দুটো উদাহরণ

[৪৪] সাজেদুল আউয়াল, ''আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : প্রসঙ্গ 'সংলাপ, কবিতা ও গান'', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেওয়া যেতে পারে। *সুবচন নির্বাসনেতে* বাবার সংলাপ : ''তবে কি সত্যি মানবতার মাথা হেঁট হবার সময় এসেছে ? যদি তাই হয় তবে সত্যিই আমি অপরাধী। সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে শাস্তি আমার পাওনা, যেমন শাস্তি পেয়েছে আমার খোকন। আমার নিষ্ঠাকে বুক্কে বেঁধে সে এগিয়ে গিয়েছিলো প্রতিবাদের দুঃসাহসে। তার সততার দাম কেউ দেয়-নি। সততাই অপরাধ। সততা কোনো গুণ নয়-সততা নির্বুদ্ধিতা। আসলে ওরা কেউতো অপমানিত হয় নি। অপমানিত হয়েছি আমি। অপমানিত হয়েছে সেই সত্য যে সত্য যুগের পর যুগ পেরিয়ে আমার এই বুকে বাসা বেঁধেছিল। প্রমাণ হয়েছে আমি অপরাধী। আমাকে শাস্তি দিন। প্রমাণ করুন সত্য অচল হয়ে গেছে। জ্বলছে শুধু মিথ্যার হুতাশন।''[৪৫] *তোমরাই* নাটকের শেষে মায়ের সংলাপ : ''আমার রঞ্জুকে আপনারা দেখলেন। এবার আপনারা আপনাদের রঞ্জুদের দিকে তাকান। হ্যামিলেনর বাঁশি বাজছে। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বনে যাচ্ছে সময়ের ক্রীতদাস। যারা যেভাবে পারছে ওদের-কে ব্যবহার করছে। ক্ষমতায় যারা আছে তারা একভাবে, যারা ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করছে তারা আরেকভাবে। রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, এই ফাঁকটা লুটে নিচ্ছে। স্বাধীনতার শত্রুরা, অদৃশ্য শক্তি যাদেরকে পুনর্বাসিত করছে একের পর এক। এই নতুন চক্রান্তকে অঙ্কুরেই বিনাশ করুন। আকবরের হাতে ছিল যে স্বাধীনতার পতাকা, আসুন আমরা আজ সেই পতাকা তুলে দিই রঞ্জুদের হাতে।''[৪৬] তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের নানা প্রসঙ্গকে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন এবং শিল্পসম্মত উপায়ে সমালোচনা করতে সমর্থ হয়েছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকগুলোতে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন অসংখ্য শিল্পী তৈরি করেছেন। অনেকেরই প্রথম নাটকের প্রযোজক আবদুল্লাহ আল-মামুন। টিভি মাধ্যমটি খুব ভালো বুঝতেন এবং নিজে দক্ষ অভিনেতা হবার কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে কাজটা আদায় করে নিতে জানতেন। তিনি ক্যামেরা চালিয়ে যখন নাটক রেকর্ডিং করতেন, তখন প্যানেলে তাঁর নির্দেশনা একটা দেখার ব্যাপার ছিল। সবাই প্যানেলে ভিড় জমাত

[৪৫] আবদুল্লাহ আল-মামুন : *নাটক সমগ্র*-১, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫০

[৪৬] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সে দৃশ্য দেখার জন্য। অর্কেস্ট্রায় সংগীত পরিচালক যেভাবে নিজস্ব ভঙ্গিতে শিল্পীদের পরিচালনা করেন, তাঁর স্টাইলও ছিল অনেকটা সে রকমের। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সবসময় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে অনেক তারকাশিল্পী টিভিতে বলেছেন এবং লিখেছেন তাঁর শিল্পী তৈরির অসাধারণ ক্ষমতার কথা। অসাধারণ নির্মাতা হিসেবে, লেখক হিসেবে এবং মঞ্চনাটকের সংগঠক হিসেবে যেমন তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সম্পূর্ণ সৃজনশীলতা দিয়ে যাঁদের অভিনয় জগতে, নাট্যজগতে তৈরি করে গেলেন তাঁদের মধ্যেও। ''আবদুল্লাহ আল-মামুন : স্রষ্টা, সাহিত্যিক হিসেবে নাটকের অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে মঞ্চের, টেলিভিশনের, চলচ্চিত্রের শিক্ষক হিসেবে তাঁর পরবর্তী দুই কি তিন প্রজন্মেরই বহু অভিনেতা ও কলাকুশলীর।''[৪৭]

মঞ্চে, টেলিভিশনে, চলচ্চিত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুন নতুনদের সুযোগ দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে। তারিক আনাম খানকে ওথেলো চরিত্রে, তৌকীর আহমেদকে *তোমরাই* নাটকের রঞ্জু চরিত্রে, *স্পর্ধাতে* তানভীন সুইটিকে অভিনয় করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। কারো মধ্যে সম্ভাবনা দেখলেই তিনি তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। নতুন নির্দেশক তৈরির জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন তারিক আনাম খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌসী মজুমদার, জগলুল, মারুফ ও ত্রপা মজুমদারসহ অনেককেই। নাট্যকার তৈরি করার জন্যও কর্মশালা পরিচালনা করেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই জগলুল আলমের ছয় বেহারার পালকি লেখা হলো। যে জগলুল হতে পারতো আবদুল্লাহ আল-মামুনের উত্তরসূরি, সে আবদুল্লাহ আল-মামুনের আগেই সবাইকে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। ''জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যশিল্পের সাধনাই ছিল যেন তাঁর একমাত্র আরাধ্য। এমন নিবেদিত নাট্যঅন্তপ্রাণ মহৎ নাট্যজন... বিচিত্র সৃষ্টির দর্পণেই বিম্বিত হবে চিরদিন।''[৪৮]

---

[৪৭] সৈয়দ শামসুল হক, 'বিশাল বাংলার নাট্যপ্রাণ পুরুষ', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৪৮] নাসির আহমেদ, 'নাট্যজন আবদুল্লাহ আল-মামুন বেঁচে থাকবেন আপন সৃষ্টিতে', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্ব, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

পেশাগত কর্মশালায় অংশগ্রহণ, জুরি বোর্ডের সদস্য, প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুন বেশ কয়েকবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মালয়েশিয়া, জার্মান, চীন, ইরাক, সিঙ্গাপুর, ভারত এমন দেশ ছিল তাঁর গন্তব্য। তবে বিদেশে যেতে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না । বিশেষ করে শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে দেশের বাইরে যেতে চাইতেন না। সবসময় মনে একটা ভয় কাজ করত কখন শরীর আরও বেশি খারাপ হয়ে পরে।

১৯৯৯ সালের কথা। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ব্যাবিলন উৎসব হয় বাগদাদে। বাংলাদেশ থেকে সরকারি পর্যায়ে ১৮ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল গিয়েছিল বাগদাদে একাদশ আন্তর্জাতিক ব্যাবিলন উৎসবে যোগ দিতে। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে এই দলে ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন, হাসান হাফিজ, তৎকালীন সংস্কৃতি সচিব কবি আজিজুর রহমান আজিজ, যুব-ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, অভিনেত্রী লাকী ইনাম, নৃত্যশিল্পী কবিরুল ইসলাম রতন, গিটার শিল্পী ড. নুসরাত মুমতাজ রূপসী, সেতার শিল্পী ইউসুফ খান, শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা নাট্যজন গোলাম সারোয়ার প্রমুখ। জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য তৎকালীন এমপি অ্যাডভোকেট আবদুল লতিফ ছিলেন দলনেতা। ইরাক তখন অবরুদ্ধ দেশ। সরাসরি সে দেশে যাওয়ার উপায় নেই। তাই যেতে হতো জর্ডান সীমান্ত পেরিয়ে। তাঁরা বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা থেকে দুবাই, দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে রয়্যাল জর্ডানিয়ানের ফ্লাইটে, জর্ডান থেকে ইরাকে গিয়েছিলেন সড়ক পথে। বাগদাদে বাংলাদেশ দলের যেদিন পারফরম্যান্স, সেদিন দেখা গেল লাইটিং করার কেউ নেই। আবদুল্লাহ আল-মামুন সাগ্রহে সে দায়িত্ব নিলেন। নিখুঁত দক্ষতায় আলোর কাজ করলেন। তিনি জাতশিল্পী বলেই বোধহয় সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিলো অচিন পরিবেশ ও অবকাঠামোতে দুরূহ সেই কাজ। গ্রিক আদলের বিশাল আকৃতি, কালো মার্বেল পাথরে নির্মিত রাজকীয় এম্ফিথিয়েটার এই প্রথম দেখেছিলেন জীবনে। দেখেছেন ব্যবিলন গিয়েছেন বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানি (রা:) মাজারে, গিয়েছেন কারবালায়, হযরত আলী (রা:) মাজার ও তাঁর বাড়িতে ।

বাংলাদেশের পক্ষে আবদুল্লাহ আল-মামুন বিদেশে যেসব বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তার মধ্যে ১১তম আন্তর্জাতিক জাপান পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি, ভারতে সাউথ এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল অব কালচারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা (১৯৭৯), যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের নেতা (১৯৮০), যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে ইন্টার ন্যাশনাল ভিজিটার্স প্রোগ্রামের আওতায় একমাস যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ (১৯৮০), পশ্চিম জার্মানির বার্লিনে জুরি বোর্ডের সদস্য (১৯৮৩), বেজিং-এ এশিয়ান ব্রডকাস্টিং; ইউনিয়নের ২৬ তম সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি (১৯৮৯), সিঙ্গাপুরে রেডিও ব্রডকাস্টিং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ওয়ার্কশপে যোগদান (১৯৯৩), ১১তম ব্যাবিলন আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি উৎসবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য (১৯৯৯) উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই বিভিন্ন দেশের নাটক ও নাট্যকারদের সম্পর্কে ধারনা নিয়ে নিজের নাট্যভুবনকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুনকে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কী, উত্তরে বলেছিলেন মানুষের ভালোবাসা কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁকে টিকেট কিনতে হয়নি। আবদুল্লাহ আল-মামুন কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ যে সকল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজক হিসেবে ১৯৭৫ সালে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার। ১৯৭৯ সালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে পান বাংলা একাডেমি পুরস্কার। প্রথম জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৮), অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (দু'বার), চিত্রনাট্যকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (দু'বার), থিয়েটার প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী সম্মাননা (১৯৯১), চিত্রনাট্যকার ও কাহিনীকার হিসেবে বাংলাদেশ ফিল্ম জার্নালিস্টস্ এসোসিয়েশান পুরস্কার, তারকালোক পদক, অলক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক (২০০০) সহ আরো অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন আবদুল্লাহ আল-মামুন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন জীবনে অনেক শিল্পী তৈরি করেছে। প্রত্যাশা করতেন তারা সে কথাটা কখনও ভুলবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের অনেকেরই অকৃতজ্ঞ আচরণে তিনি আঘাত পেয়েছেন। শেষের দিকে অসুখের কারণেই বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর একটা ধারণা হয়েছিলো লোকজন বোধহয় তাঁকে আর আগের মতো মনে রাখেনি, ভুলতে বসেছে। কিন্তু তাঁর ধারণা যে কত অমূলক, তা প্রমাণ হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরদিন ২২ আগস্ট। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো, এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভ খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। তাঁর প্রাণহীন দেহ প্রায় আড়াই ঘণ্টা জানা-অজানা প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্যে ছিল। বেঁচে থাকতে যদি দেখতে পেতেন, এত মানুষ তাকে ভালোবাসে তাঁর গুণের কদর করে, তাহলে তাঁর জীবনে আর কোনো দুঃখ অভিমান থাকত না। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জনসমুদ্রের ভালোবাসা প্রমাণ করেছে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব

নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন আগে কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বাধীনতা আবদুল্লাহ আল-মামুনের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছিল। নতুন দেশ, নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের তাগিদ থেকে ভালোবাসার মাতৃভূমিকে যারা কলুষিত করার চেষ্টা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি বারবার ফুঁসে উঠেছেন। *সুবচন নির্বাসনে* থেকে *জন্মদিন* পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে তাঁর এই প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ের রক্তক্ষরণটা, কান্নাটা তিনি সহজাত ক্ষমতায় ধরতে পারতেন, তা সেটা ব্যক্তই হোক আর অব্যক্তই হোক। আর তা তাঁর নাটকে উঠে আসত সহজ সাবলীলতায়। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় নাট্য প্রতিযোগিতা। ডাকসুর নাট্যবিভাগ 'ডাকসু নাট্যচক্র' নামে পরিচিত হয়। ডাকসু নাট্যচক্র স্বাধীনতা উত্তরকালীন চর্চার অগ্রবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের জন্য বয়ে এনেছে সাংস্কৃতিক মুক্তির আকুলতা ও প্রেরণা। আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন-

> ১৯৭১ সালে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ন' মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবন ধারাটাই বদলে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ এবং অর্জন এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জাতিসত্তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জাগিয়ে তোলে। এই ধাক্কা নাটকের গায়েও লাগে। তাই দেখা যায় স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই বাংলাদেশের নাটক নতুনভাবে পাখা মেলতে শুরু করে। নতুন যে ব্যাপারটি এই পর্যায়ে লক্ষণীয়, তা হলো, যুদ্ধ-ফেরত মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীরা একেবারে গোড়াতেই প্রচলিত নাট্যচর্চার বাইরে অবস্থান নিলেন। বোঝা গেল, তাঁরা নতুন কিছু একটা করতে চান।[৪৯]

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে নতুন নতুন নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক বেরিয়ে আসে। পরবর্তীতে এঁরা বিভিন্ন নাট্যদলকে নতুন শক্তিতে বলীয়ান করে তোলেন। প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারেরাও নাটক লিখতে উৎসাহ পেলেন। সেই সুযোগ নিলেন আবদুল্লাহ আল-মামুনও। তাঁর *শপথ* নামে একটি নাটক ঢাকা

[৪৯] আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'বাংলাদেশের নাটক রচনা: ধারা ও বিবর্তন', *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), সোসাইটি ফর এডুকেশন ইন থিয়েটার, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ মঞ্চস্থ করে। এ নাটকটিও অভিনব। অন্তত প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রমী একটি রূপক নাটক। সমাজসচেতন বলে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক সংলাপে শাণিত। তবে আঙ্গিকের দিক থেকে গতানুগতিক নয়। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। নিজের নাট্যকর্ম সম্পর্কে আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজেই বলেছেন-

> স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমসাময়িক জীবন সামাজিক অসঙ্গতি পারিবারিক অবিচার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা নিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন লিখেছেন নাটক সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, সেনাপতি, এখনো ক্রীতদাস, তোমরাই, কোকিলারা, স্পর্ধা, মেরাজ ফকিরের মা প্রভৃতি।[৫০]

থিয়েটার স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ, আবদুল্লাহ আল-মামুনের সহকর্মী তথা অনুপ্রেরণা দাতা, ত্রৈমাসিক থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার আবদুল্লাহ আল-মামুন সম্পর্কে লিখেছেন- ''মুক্তিযুদ্ধ আবদুল্লাহ আল-মামুনের একটি প্রিয় বিষয়। তাঁর অনেক নাটকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তারুণ্যের বিপথগামিতা ঘুরেফিরে এসেছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মামুন শক্ত হাতে কলম ধরেছে।''[৫১] যারা স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান, মৌলবাদী অপতৎপরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছে তাদের সাথে হাত মেলাতে পারেননি তিনি। অতি সচেতন হয়ে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও মুক্তিযোদ্ধাদের নেতিবাচক সমালোচনা করে স্বাধীনতা বিরোধীদের পা রাখার জায়গা করে দেননি। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জনের পক্ষে তাঁর দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অবস্থান শুধু নাট্যকর্মী নয়, সারাদেশের সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে। এই জায়গাতেই তিনি অন্যদের ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছেন নিজেকে। তাইতো তাঁর বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন সময়ে মানুষকে

---

[৫০] আবদুল্লাহ আল-মামুন, 'বাংলাদেশের নাটক রচনা: ধারা ও বিবর্তন', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : ফিরে দেখা* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), থিয়েটার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০৪

[৫১] রামেন্দু মজুমদার, 'সংশপ্তক মামুন', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক* (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদক), ৩৭তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ১৫৯-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় চমকে দিয়েছে। তিনি কখনোই সেইসব নাট্যকারের দলে ভিড়তে চাননি, যারা সময়ের দাবি থেকে দূরত্বে অবস্থান নিয়ে নিরীহ, নিরাপদ ও অজাতশত্রু নাট্যচর্চায় আগ্রহী। তাঁর নাটক সরাসরি দেশের শত্রুকে, মানুষের শত্রুকে আঘাত করেছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যেকোনো কাজে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন। ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সমন্বয় পরিষদ *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* নামে ১০ পর্বের একটি টিভি ধারাবাহিক ডকু ড্রামা নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ওই সময় ড. অনুপম সেন এ সংগঠনের সভাপতি, অ্যাডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এর সকল ব্যয়ভার বহনের নিশ্চয়তা দিলে মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় গণমাধ্যম সম্প্রচারের (নিমকো) তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল-মামুনের সঙ্গে ঢাকায় দেখা করেন। ধারাবাহিকটি নির্মাণের প্রস্তাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৯৯ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশন কক্ষে দুমাস ধরে বিরামহীন এ ধারাবাহিকের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে। যাবতীয় তথ্যায়নের উদ্যোগ নেন নাট্যজন প্রদীপ দেওয়ানজী। আর সে তথ্য নিরীক্ষণ করতেন ড. অনুপম সেন, মরহুম দিলোয়ার হোসেন, চৌধুরী জহুরুল হক, ড. হামিদা বানু, ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী। নগরীর আইস ফ্যাক্টরি রোডের অপারেশন দিয়ে শুটিং শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে শুভপুর ব্রিজ, কাপ্তাই, কক্সবাজারসহ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শুটিং চলে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যুববিদ্রোহ থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য ঘটনাবলি এ ধারাবাহিকে পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে। রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান, ফেরদৌসী মজুমদার, শর্মিলী আহমেদ, আজিজুল হাকিম ছাড়াও প্রায় দু'হাজার শিল্পী এ ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। এটির পুরো নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল প্রায় দুবছর। একাজের জন্য তিনি একমাস চট্টগ্রামে থেকেছেন। সেখানকার গ্রুপ

Dhaka University Institutional Repository

থিয়েটারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডকু-ড্রামাটির চিত্রায়ণ করেন। সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এ কাজে তাদের সব ধরনের উপকরণ ও সদস্য দিয়ে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিন বাহিনীর সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এ ধারাবাহিকটির নির্মাণ অসম্ভব ছিল। সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে ১০ পর্বের এ ধারাবাহিকটি চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেন। ধারাবাহিকটি যখন শেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সেন্সরের জন্য জমা দেয়া হয়, তখন বাধ সাধেন তদানীন্তন তথ্যপ্রতিমন্ত্রী। মেয়রের সঙ্গে এই ধারাবাহিক নির্মাণে তার মতানৈক্য ছিল। ফলে টিভিতে প্রচারের তারিখ নির্ধারণের পরও অনেক শ্রমের ফসল ধারাবাহিকটি প্রচারিত না হওয়ায় আবদুল্লাহ আল-মামুন খুব আশাহত হয়েছিলেন। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসে এটি বাক্সবন্দি করে ফেলে। *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* প্রসঙ্গে অভিনেতা রামেন্দু মজুমদার বলেছিলেন-

> আবদুল্লাহ আল-মামুন এ ধারাবাহিকের প্রদর্শন দেখে যেতে পারলে সত্যিই খুশি হতেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ ধারাবাহিকটি অবিলম্বে প্রদর্শনের দাবি জানিয়ে দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার আরও বলেন, 'এটার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস ও অবদান উঠে এসেছে এ ধারাবাহিকে'।[৫২]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে আবদুল্লাহ আল-মামুন সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। তাঁর নাটকের প্রধান প্রবণতা সমাজ-বাস্তবতার রূপায়ণ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের নানা টানাপোড়েন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আশা, হতাশা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রভৃতি তিনি নাট্যকাহিনীর উপজীব্য হিসেবে বেছে নেন। তরুণ সমাজের অবক্ষয় এবং তার পিছনের কারণসমূহ উৎঘাটনে তিনি ছিলেন সতর্ক শিল্পী। তাঁর অনেকগুলো নাটক মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালের সমাজ বাবস্তবতার নিরিখে রচিত। মুক্তিযুদ্ধ-সংলগ্ন বছরগুলোর সমাজকে চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁর নাটকে স্পর্শ করেছে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ চেতনা।

---

[৫২] আজাদ তালুকদার, 'জীবনের সেরা কাজটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকে আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রত্যক্ষ করেছেন সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টিতে। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে সমাজকে তিনি দেখেছেন বাস্তবতার নিরিখে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজে, বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে দেখা দেয় চরম অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিপথগামী তরুণ সম্প্রদায় খুন-সন্ত্রাসসহ মূল্যবোধ বিবর্জিত বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কাঁধে রাইফেল নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অথচ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে গিয়ে হাত মিলিয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় দেখা দেয় এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় নেমে আসে অস্থিরতা। এর মধ্যে এক শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধা, যারা অবৈধ ব্যবসায় নিজেদের জড়ায়নি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে এগিয়ে যেতে চায়। তাঁরা ক্রমশ লাভ করতে থাকে এক বেদনাময় জীবন পরিণতি। শৈশব থেকে প্রতিবাদী চরিত্রের মেধাবী নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে অনিবার্যভাবেই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সমাজ বাস্তবতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে। সমসাময়িক বিষয়ের পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার শত্রুদের নতুন পরিচয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা। রাজনৈতিক নেতাদের দেশদ্রোহীমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে ঘুষ, দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জনে অবগাহন। মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার পরিজনদের মানবেতর জীবন-যাপন এসব কিছুই নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবন ও মানসে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তিনি যা দেখেছেন তাই নাট্যকাহিনীতে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ভালোবাসায় সিক্ত একজন নাট্যকার হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতির আত্মঅহংকার। মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার এরকম আত্মত্যাগ ও জীবন বিসর্জনের ইতিহাস সত্যিই বিরল। দীর্ঘ নয় মাস বাংলার ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষ, কুলি, মজুর, ইপিআরসহ সব শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে মুক্ত করে স্বদেশকে, অর্জন করে নিজস্ব জাতীয় পতাকা, সম্মান ও বিজয়ের জয়টিকা। এ যুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক বিরাট অধ্যায়। এ যুদ্ধের ঘটনা একদিকে যেমন গৌরবের অপরদিকে দুঃখের। বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালির এক রক্তাক্ত দলিল মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে সাহস প্রকাশের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশের সাহিত্যে বিষয় ও ভাবের দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ সৃজনশীল সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের গণজাগরণ ও বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের সাহিত্যকে আলোকিত করেছে। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিফলন দৃশ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে নাট্যচর্চা যে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। নাটকের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন-

> স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাহিত্যের যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা নাটক। স্বাধীনতা চেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের সাহিত্যের ধারায় নাটক ইতোমধ্যেই নির্মাণ করেছে গৌরবোজ্জ্বল এক ইতিহাস। বস্তুত, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাচেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য অভিন্ন সত্তায় গ্রথিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিসত্তাকে নতুন চিন্তায় করেছে পুনর্জাত, শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও ঘটেছে এর

Dhaka University Institutional Repository

> উজ্জ্বল প্রতিফলন। স্বাধীনতার রক্তধারায় স্নাত হয়ে জন্ম নেয়া বাংলাদেশের নাটক এখন এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল।[৫৩]

প্রাক মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাটকের মৌল পার্থক্য নির্দেশ-সূত্রে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য-

> যে বিষয়বস্তু নিয়ে আগেকার নাটকগুলো রচিত হতো, সে সব বিষয় '৭১ পরবর্তী নাট্যকর্মী দর্শকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হল না। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল নতুন নাট্য রচনা। আগেকার নাটকের সাথে এই নতুন নাটকের প্রধান পার্থক্য হল নাটকে এখন একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য এল। বক্তব্য ছাড়া কোন নাটক আজকের নাট্যকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল না। বেশির ভাগ নাটক রচিত হল সমকালীন সমাজ নিয়ে। সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা-বঞ্চনা, আনন্দ-উল্লাসকে উপজীব্য করে নাটক রচিত হল। ...নাট্যকাররা তাঁদের রচনায় সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিলেন।[৫৪]

'নাটক হোক সমাজ বদলের হাতিয়ার' মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই স্লোগানে মুখরিত হলো বাংলাদেশের নাট্য-আঙিনা। বাংলাদেশের নাট্যদলগুলো শ্রেণিসংগ্রামের যে ঘোষণা দিয়েছিল আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকেও তার সচেতন প্রতিফলন দৃশ্যমান। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর নাট্যচেতনার উৎসারণকেন্দ্র। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের নাটকে যে প্রতিবাদ ছিল সুপ্ত মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে সেখানে যোগ হলো নতুন মাত্রা। ১৮৭৬ সালে জারিকৃত ব্রিটিশ সরকারের 'অভিনয় নিয়ন্ত্রন আইন' শীর্ষক কালাকানুন যথেচ্ছ ব্যবহার করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি নাটক রচনা ও নাট্যচর্চার পথে একটা প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছিলো। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সরকার শতাব্দী প্রাচীন অভিনয় আইন সংশোধন করে নতুন আদেশ জারি করেন ১৯৭৫ সালের জুন মাসে, খুলে গেল দীর্ঘদিনের বদ্ধ শৃঙ্খল। ১৯৭৫ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশের দুটো উল্লেখযোগ্য ধারা-

---

[৫৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্যে*, প্রথম আজকাল সংস্করণ : বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ১৪১

[৫৪] রামেন্দু মজুমদার, *বিষয় : নাটক*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. দেশে জাতীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাট্যভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদানুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালের 'The Bengla Amusement Tan Act 1922' (Bengal Act V of 1922) সংশোধন করেছেন।

খ. অভিনয়ে অনুমতি দেবার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় অহেতুক হয়রানি এড়াবার জন্যে এই পরীক্ষা প্রণালী সহজ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে ১৮৭৬ সালের Act No. 29 of 1876 (16th December 1876) 'An act for the better control of dramatic performances'. আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।[৫৫]

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্যকারেরা সাহসি হয়ে উঠল। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি নাটক রচনা শুরু করলেন। তারা এক একজন হয়ে উঠলেন মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজ গড়ার কারিগর। আবদুল্লাহ আল-মামুন সেই ধারার একজন জনপ্রিয় ও অগ্রগণ্য নাট্যকার। বাংলাদেশে তাঁর রচিত নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে সর্বাধিক। তাঁর নাটকের প্রিয় বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু বন্দিশিবিরে অবরুদ্ধ ঢাকায় থেকে তিনি অনুভব করেছেন এক অব্যক্ত বেদনা, হৃদয়ে এক চরম উত্তেজনা ধারণ করে কাটিয়েছেন একাত্তরের ন'মাস। *সুবচন নির্বাসনে* দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁ র মঞ্চ নাটক রচনার শুরু। তখন থেকেই মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদ্ধের বিরোধিতা ইত্যাদি তাঁর নাটকে ফিরে ফিরে এসেছে। নিজেকে তিনি স্পষ্টভাবে এবং উচ্চকিত কণ্ঠে সম্পর্কিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সাথে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির নানা অপকৌশল তিনি চিহ্নিত করেছেন নাটকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতা সহজেই তাঁর নাটকে চোখে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র, *আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটক সমগ্র-১*, *নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন* ইত্যাদি তাঁর নাটক সংকলন। মুক্তধারা, থিয়েটার,

[৫৫] আলী যাকের, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬ পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

অন্যপ্রকাশ, নালন্দা সহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক প্রকাশিত হয়েছে। ''নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন সংকলনে দশটি নাটক স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ছ'টি নাটক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে না হলেও, মুক্তিযুদ্ধের ফলে সমাজে যে বিবর্তন ঘটেছে, তা-ই নাটকগুলোর উপজীব্য। এই নাটকগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত একজন নাট্যকারকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। 'সুবচন নির্বাসনে', নাটকে যে চেতনার উন্মেষ, 'মেরাজ ফকিরের মা'তে তা আরো শাণিত হয়েছে।''[৫৬] বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটক লিখেছেন, তবে তাঁর রচিত যে সব নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে সেসব নাটক নিয়েই আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ আল-মামুন রচিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য নাটকের তালিকা :

ক্রমিক	নাটকের নাম	রচনাকাল
১	সুবচন নির্বাসনে	১৯৭৪
২	এখন দুঃসময়	১৯৭৫
৩	এবার ধরা দাও	১৯৭৭
৪	সেনাপতি	১৯৮০
৫	আয়নায় বন্ধুর মুখ	১৯৮৩
৬	এখনও ক্রীতদাস	১৯৮৪
৭	তোমরাই	১৯৮৮
৮	তৃতীয় পুরুষ	১৯৮৮
৯	বিবিসাব	১৯৯১
১০	দ্যাশের মানুষ	১৯৯৩
১১	মাইক মাস্টার	১৯৯৭
১২	মেহেরজান আরেকবার	১৯৯৮

[৫৬] *নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন,* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, দ্রষ্টব্য : ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের বাংলা নাটকের পথিকৃত, কুমোর যেভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করেন বৈচিত্রময় তৈজসপত্র তিনিও তদ্রুপ শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নির্মাণ করেছেন নানা আঙ্গিকের নানা বিষয়ের নাট্যকর্ম। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি নাটক রচনা করলেও আমাদের আলোচ্যবিষয় তাঁর নাটকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা। তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম স্বাধীনতার পরে দেখাগেল উল্টোচিত্র। নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাদেরকে যাতে ভুল পথে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি চালিত করতে না পারে সেদিকে সজাগ প্রহরির মতো কাজ করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারন ও লালন করেছিলেন তাইতো তাঁর নাটকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাসের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭১ সালে যে চেতনাকে ধারণ করে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দেয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। এরকমই বিষয় নিয়ে ১৯৭৪ সালে আবদুল্লাহ আল-মামুন মঞ্চায়ন ও প্রকাশ করলেন নাটক *সুবচন নির্বাসনে*। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে সর্বব্যাপ্ত হতাশা, প্রত্যয় ও প্রমূল্যের অবক্ষয় এবং সামাজিক বৈনাশিকতার পটে রচিত হয়েছে *সুবচন নির্বাসনে* নাটক। ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে আস্তে আস্তে একটা নতুন দেশ নির্মিত হচ্ছে। সে সুযোগে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকেই দ্রুত ভাগ্য পরিবর্তনের খেলায় মেতে ওঠে। সহজ, সরল ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জীবনের পথচলা অনেকের কাছেই বোকামি মনে হয়। ফলে সমাজে নেমে আসে হতাশা, বেড়ে ওঠে আইন অমান্য করার প্রবণতা। সততাই মহৎ গুণ। লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। এ ধরনের সনাতন ধারণাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সততা, সুনীতি, দেশপ্রেম, মানবিকতা যেন আজকের যুগে অচল হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে সামাজিক অবক্ষয়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে নাটকের কাহিনী। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেক মেধাবী ছাত্র চাকরি পাচ্ছে না অথচ লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কহীন অনেকেই চাকরি নামক সোনার হরিণ সহজেই পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে অনৈতিক পথে। যা স্বাধীন দেশের একজন নাট্যকারকে পীড়িত করে। স্কুল শিক্ষক তাঁর প্রথম সন্তান খোকনকে শিখিয়েছিলেন 'সততাই মহৎ গুণ'। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশে সেটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। খোকনের প্রতিবাদমুখর সংলাপে-

> আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এ বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার বাবা। আমি তাঁর প্রথম সন্তান। ইনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন 'সততাই মহৎ গুণ'.....তাঁর কথা আমি ফেলতে পারিনি। সৎ হয়েছিলাম। সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৎ হয়ে বাঁচতে পারিনি।[৫৭]

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে সততা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বারবার। লেখাপড়া শেখা মেধাবী ছাত্রের চাকরি পাওয়ার অধিকার আছে। সেখানে লেখাপড়া না করে খোকনের বন্ধু অন্যায়ভাবে চাকরি পেয়েছে। বন্ধু আবার খোকনের বাবা অর্থাৎ স্কুল শিক্ষককে মিষ্টি খাওয়াতে এসেছে। সমাজের মধ্যে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বন্ধুর অভদ্র ব্যবহারে-

> বাবা : .... মুরব্বিদের শ্রদ্ধাভক্তি করতেও শেখনি? একটা সালাম দিতেও জানো না?
>
> বন্ধু : ও, তাই বলুন-ওসব ভঙ্গিসর্বস্ব আদাব সালামের যুগ তো কবেই শেষ হয়ে গেছে[৫৮]

অন্যায়ভাবে কার্য উদ্ধার করে যে সমাজে গর্ব করে মানুষকে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ায় সে সমাজ কলুষিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বন্ধু চরিত্রের চাকরি পাওয়ার অযোগ্যতা ধরা পরেছে স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে-

> বন্ধু : যেখানে ফাস্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া ক্যান্ডিডেটরা হালে পানি পেল না, সেখানে আমি থার্ড ডিভিশন ঠিক কূলে পৌঁছে গেলাম। চাকরির বাজারে কেউ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কনসিডার করে না।
>
> বাবা : তবে কি এক্সপেরিয়েন্স?
>
> বন্ধু : এক্সপেরিয়েন্সই বটে-তবে যে লাইনের চাকরি সে লাইনের নয়-একটু অন্য লাইনের এক্সপেরিয়েন্স-ওই মানে একটু লেনদেনের ব্যাপার আর কি।[৫৯]

---

[৫৭] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

[৫৮] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেকে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ, অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনকে বড় করে দেখেছে অনেকেই। শিক্ষক বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে কনিষ্ঠ পুত্র তপন বেছে নিয়েছে অন্যায়ের পথ। অর্থের পেছনে ছুটেছে নীতি নৈতিকতার ধার ধারেনি। বোন রানুর সঙ্গে কথোপকথনে তার ইঙ্গিত প্রস্ফুটিত হয়েছে-

> রানু : এত টাকা তুই কোথায় পেলি? তপু-তপু তুই টাকা কোথায় পেলি? এত টাকা কেন? এ কার টাকা?
>
> তপন : হাওয়ার টাকা। আদর্শ পড়েছে মাটিতে; টাকা উড়ছে হাওয়ায়। আদর্শকে পায়ে মাড়াতে পারলেই হাতের মুঠোয় টাকা।[৬০]

যেখানে আদর্শ নীতি নৈতিকতার কোন মূল্য নেই সেখানে সৎ থেকে কী লাভ এ বিষয়টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তপন চরিত্রের মধ্যে। মা মরা মেয়ে রানু সেই ফ্রকপরা বয়স থেকে সংসারের হাল ধরেছিল। বাবা আর দুই ভাইকে একাই সামলাত। সেই রানুকেও বাবা মনে রাখতে বলেছিল সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। আরো বলেছিল একটা মেয়েকে এক এক করে তিনটা সংসারে পা রাখতে হয়। বাপের সংসার থেকে শ্বশুরের সংসার, তারপর নিজের সংসার। রানু ছিল লক্ষ্মী মেয়ে। বাবার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল রানু। রানুর বিয়ে হলো এক কেরানির সাথে। যে কেরানির বস বিয়ে করার কারণে রীতিমতো কেরানিকে প্রশ্নের সম্মুখিন করেছে। চাকরি চলে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। সে তার নিজের কালা খোঁড়া শালিকে বিয়ে দিতে চেয়েছিল কেরানির সাথে। অবশেষে বসের শালিকে বিয়ে দিয়ে দিবে এমন প্রতিশ্রুতি ও নিজের স্ত্রীকে দিয়ে বসের মনোরঞ্জন করানোর আশ্বাস দিলে বস অযোগ্য কেরানিকে চাকরিতে বহাল রাখার আশ্বাস দিলেন। কেরানির কাছে স্ত্রীর মর্যাদার চেয়ে চাকরিটাই বেশি মর্যাদাবান

---

[৫৯] ' নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[৬০] ' নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বলে মনে হয়েছে। সমাজের অবক্ষয়ের স্বরুপ ধরা পরেছে অমর্যাদাকর বিষয়টিতে। স্বাধীনদেশে নারীরা সম্মান পাবেন তাদের অধিকার বাস্তবায়িত হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্ত ঘটেছে তার উল্টো। যা কেরানির সংলাপে ফুটে উঠেছে-

> কেরানি : .... চাকরি হারানো চলবে না। জানো গাঁটের পয়সা খরচ করে এ দু'টো বোতল আমি কিনে এনেছিলাম।
>
> রানু : আমি? আমি মদ ঢেলে দেব? স্ত্রীর চেয়ে চাকরি তোমার কাছে বড় হলো। আমি যাচ্ছি।
>
> কেরানি : তুমি নিজে থেকে না গেলে, আমিই তোমাকে যেতে বলতাম।...তুমি একেবারেই অচল।[৬১]

সারাজীবন যে শিক্ষক আদর্শের কথা বলেছেন আজ তা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে । স্কুল শিক্ষক বাবার প্রশ্ন মানুষ কি সত্যি আজ স্ত্রীর বিশ্বস্ততার চেয়ে টাকার জন্য কাঁদবে। তবে কি সত্যি মানবতার মাথা হেঁট হবার সময় এসেছে। যে স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছে দুই লক্ষ মা বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে দুই কোটি লোক উদ্বাস্তু হয়েছে আর আজ মাত্র স্বাধীনতার দুই বছরের মধ্যে প্রকাশ্যে এমন প্রশ্নের উচ্চারণ স্বাধীন দেশে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। নাটকের সমাপ্তিতে এসে বিচারকের কাছে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার মানসে নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন স্বাধীনতা পরবর্তী যে বাংলাদেশ চেয়েছিলেন তার প্রতিধ্বনি করেছেন-

> বিচারক : আসুন, রায় দিন। এক বৃদ্ধ স্কুল-মাস্টার নিজের অপরাধ স্বীকার করে বিচার চাইছে। আসুন, এগিয়ে আসুন।[৬২]

এখানে বিচারক নির্দিষ্ট কেউ নয়। বিচারকের আসনে যে কেউ বসতে পারে। তবে এখানে বিচারক সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, নীতি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের বিবেক যাদের অন্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত। আদর্শবাদী একজন শিক্ষক তাঁর সততার, আদর্শের প্রতিফলন চাচ্ছেন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের

---

[৬১] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[৬২] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *সুবচন নির্বাসনে*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

কাছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালের সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈতিক অধঃপতনকে শিল্পসম্মত ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে।

১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একই সঙ্গে হানা দেয় বন্যা এবং কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের দেশে মানুষ যেমন দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, অপরদিকে বন্যার সুযোগে ধূর্ত ব্যবসায়ী, মজুতদারেরা মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটি যে চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাতে দেখা গেল নীতি-নৈতিকতা তথা মানবিকতা শূন্য এক স্বার্থান্বেষী মহল। যারা স্বাধীনতার চেতনা ভুলে গিয়ে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি লালসা চরিতার্থ করার কাজে লেগে গেল। এদেরই বিরুদ্ধে সজাগ প্রতিবাদী এক নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুনকে পাই *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫) নাটকে।

১৯৭১ সালের দুঃসময়ে যে মানুষ গুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাদেরই কেউ কেউ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে শোষকে পরিণত হয়েছিল। যে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্ত বাংলাদেশে সেই মা-বোনদের অসহায়তার সুযোগ পেয়ে এক শ্রেণির মুন্সি, বেপারিরা তাদের ভোগ্য পণ্য বানাতে চায়। বন্যাকবলিত জরিনা তিন দিন তিন রাত ধরে না খেয়ে আছে এ সুযোগ নিয়েছে মুন্সি-

> মুন্সি : জরিনা-আমার লগে যাইবি এক জায়গায়?
>
> জরিনা : কোহানে চাচা?
>
> মুন্সি : মেলা ভাত আছে। পাতিল উপচাইয়া পরতাছে। খইয়ের মতন ফুটতাছে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে।[৬৩]

[৬৩] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখন দুঃসময়*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের টাউট মুন্সি জরিনাকে এনে বেপারির হাতে তুলে দেয়। জরিনার ক্ষুধার জ্বালা মিটলেও সে মুন্সির অশুভ উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাইতো বেপারির পাহারাদার সোনার কাছে জরিনার দুঃখ কষ্ট ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ পেয়েছে-

> জরিনা : তিন দিন তিন রাইত মাচার উপরে বইসা আছিলাম। কেউ আমারে একটা দানা খাইতে দেয় নাই। মুন্সি গিয়া কইল, 'জরিনা যাইবি এক জায়গায়-মেলা ভাত আছে-ভরা পাতিল উপচাইয়া পরতাছে-লাখে লাখে' স্বপনের মইদ্যে চইলা আইলাম হের লগে। কিন্তু অহন যে এই ভাত আর গলা দিয়ে নামে না রে সোনা।[৬৪]

সদ্য স্বাধীনদেশে নারীরা যে সম্মানের অধিকারী হতে চেয়েছিল সে আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে বাস্তবায়ন হয়নি। অভাব, দরিদ্রতার কারণে নারীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অসৎ চরিত্রের লোকেরা তাদের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতো। যে অন্যায়-অত্যাচার, বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার দুবছরের মধ্যেই সুযোগ সন্ধানী ধূর্ত ব্যবসায়ীরা মানবতা, বিবেক বিসর্জন দিয়ে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। সম্পদের নেশা তাদের নর পিশাচে রূপান্তর করেছে। যে মানুষগুলো কিছুদিন পূর্বেও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, সময়ের ব্যবধানে আজ তারা নিজেরাই শোষক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বন্যার কারণে বেপারি মানুষের সাহায্য না করে সুযোগ নিচ্ছে-

> বেপারি : আরে মিয়া, এই বন্যার টাইমে পাবলিক জানমাল লইয়া ব্যস্ত। ওই রোজ কেয়ামতের ইয়া নাফসির অবস্থা আর কি।...বুজলা ?
>
> মুন্সী : বেবাক বুইজ্যা ফালাইছি।
>
> বেপারি : মিছা কইও না। বেবাক বোঝ নাই। পোয়াখানেক বুজছ। যাউক হেতেই চলব। অহন হোন, এই বন্যার টাইমে আমি কিছু ফালতু ফায়দা লুটতে চাই।[৬৫]

মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই যেভাবে একত্রিত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। *এখন দুঃসময়* নাটকে টাউট মুন্সীর অন্যায় অত্যাচারে জনগন অতিষ্ঠ হয়ে যেন মুক্তিযুদ্ধের

---

[৬৪] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন'(সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), *এখন দুঃসময়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৬৫] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন'(সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), *এখন দুঃসময়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতিকে ধারণ করে আবার একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেছে। বিপদে পড়ে মুন্সী যখন বেপারির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন বেপারি তার কুটবুদ্ধি খাটিয়ে জনগনের সাথে মিশে যেতে চায়-

> মুন্সি : বেপারি আমি তুমার আপন মানুষ।
>
> বেপারি : তুমি মিয়া পাবলিক ক্ষেপাইছ। তুমরে আপন মানুষ কইয়া আমি নিজের কইলজায় চাক্কু মারুম। আমিও অহন পাবলিক। আমিও তুমারে ধাওয়া করুম।[৬৬]

নাটকের প্রাথমিক অংশে স্বাধীনদেশের অবক্ষয়ের চিত্র নাট্যকার তুলে ধরলেও এক পর্যায়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ করেছেন দুর্নিতির বিরুদ্ধে তথা দুর্নিতিবাজদের বিরুদ্ধে। 'প্রাকৃতিক বা জাতীয় দুর্যোগে যেখানে মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে, যেমন দাঁড়িয়েছিল বছর কয়েক আগেও, ১৯৭১-এ; কিছু মানুষের সেই মানসিকতা স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিরোহিত হওয়ায় বেদনাহত হয়েছিলেন নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন'।[৬৭] *এখন দুঃসময়* নাটক সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে আবদুল্লাহ-আল মামুন বলেছেন-

> বন্যা বলো আর যে কোনো ধরনের মহামারী বলো, আমাদের গ্রামাঞ্চলের প্রবলেম কিন্তু সেইম। [....]আমি লিখেছি বন্যার সময় মানুষের কী দুর্দশা হয় আর রাজনৈতিক ভাবে এটাকে কীভাবে ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু চিরকালই এক।[৬৮]

স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের শপথ ভুলে গিয়ে বেপারি ও গ্রামের টাউট মুন্সীর মতো লোকেরা যখন ভোগবাদী মানসিকতা লালন করছিল তখন স্বাধীনদেশের সজাগ এক কাণ্ডারি এদেরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। এদের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন বেপারির পাহারাদার, সোনা চরিত্রের প্রতিবাদি সংলাপে-

---

[৬৬] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন'(সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), *এখন দুঃসময়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৬৭] সৌমিত্র শেখর, 'আবদুল্লাহ-আল মামুনের নাটকে সমসময়', *থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৮ তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭৭

[৬৮] সৌমিত্র শেখর, 'আবদুল্লাহ-আল মামুনের নাটকে সমসময়', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ফেব্রুয়ারি ২০১১, নবযুগ প্রকাশনী, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

> সোনা : বেপারি বন্যার পানিতে মানুষ যখন না খাইয়া মরে–তুমি তখন ক্ষেত খামার কিনতে চাও, না? বেপারি, মা বইনের পেটে ক্ষিধা লাগছে খবর পাইলেই তুমার টেকার থলির মুখ খুইলা যায়, না?[৬৯]

স্বাধীনদেশে মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে এসবই প্রত্যাশিত। যে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, স্বাধীনতার কিছুদিন পরে স্বাধীনতার শত্রুরা নতুনভাবে পুরনো পথে আবার আবির্ভূত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে। *এখন দুঃসময়* নাটকের শেষাংশে নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন সোনা চরিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আবেগকেই কাজে লাগিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে ঘায়েল করার জন্য।

আবদুল্লাহ-আল মামুনের *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭) নাটকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অবক্ষয়ের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চালচিত্র যেমন হওয়ার কথা ছিল বাস্তবে পুরোপুরি সে দিকে সমাজ অগ্রসর হতে পারে নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে গিয়ে অসাধু লোকজন অবৈধ উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। একজন সম্পদ খরচ করার জায়গা পাচ্ছে না, আরেকজন শিক্ষিত হওয়ার পরেও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছে না। এরকম বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে *এবার ধরা দাও* নাটকে।

এবার ধরা দাও নাটকের সবিনয় নিবেদন অংশে নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন বলেছেন-

> মূল্যবোধগুলোর যে অধোগতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের নাড়া দিয়েছে। আমি আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করে শিউরে উঠেছি, তৎকালীন বাংলাদেশে বিক্ষুব্ধ তারুণ্য দিশেহারা হয়ে এক অলীক শূন্যতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক হল, অনুজপ্রতিম তারুণ্যকে পথ নির্দেশের পরিবর্তে অগ্রজরা ধিক্কার দিয়ে উঠেছেন। ফলে ধরেই নেয়া হচ্ছিল যে, একটি পুরো জেনারেশন রসাতলে গেছে, আর কোনো আশা নেই, সুতরাং এদেরকে যতদূর সম্ভব কনডেম করাই শ্রেয়। আমার মনে প্রশ্ন এসেছিল, যত সহজে, যত আয়েসে আমরা পূর্বসূরীরা চলমান পরিবেশের শিকার-

[৬৯] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন' (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), *এখন দুঃসময়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদেরই উত্তরসূরীদের এককথায় খারিজ করে দিচ্ছি, ব্যাপারটা কি এতই সাধারণ? একি আসলে বিশ্রী রকমের আত্মপ্রবঞ্চনা নয় ? অগ্রজের ব্যর্থতার জন্যে একটি জেনারেশন শূন্যতার মাঝে হারিয়ে যাবে, অথচ ঐ অগ্রজের প্রতি অঙ্গলি নির্দেশও করা হবে না, এমন তো হওয়া উচিত নয়। তাই আমি ঠিক করলাম, বলব যে 'এবার ধরা দাও'। বললাম, পুরোপুরি ইমোশনাল হয়ে খুবই দ্রুততার সাথে আমি নাটকটি লিখেছিলাম। ...'এবার ধরা দাও' আমার ব্যক্তিগত আবেগের ফলাফল। আমি যা অনুভব করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তাই বলতে চেয়েছি।[৭০]

এবার ধরা দাও নাটকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সংকট, হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনদেশে একজন মানুষ স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকবে যোগ্যতানুযায়ী কাজ পাবে এটাই স্বাভাবিক। তরুণ একজন শিক্ষিত বাবার শিক্ষিত বেকার যুবক। পড়ালেখা শেষ করেও সে ভালো কোনো কাজ না পেয়ে আদর্শ, নীতি, নৈতিকতা ধরে রাখতে পারছে না। হতাশাগ্রস্থ বাবা ছেলেকে অর্থ উপার্জনের জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। তাইতো তরুণ হন্য হয়ে ভালো কোনো কাজের সন্ধানে নেমেছে-

> তরুণ : .. কাজ চাই আমার। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। কাজের জন্য আমার মস্তিষ্ক উৎপীড়িত, হৃদয় উদ্বেলিত আর এই যে দেখছেন দুটো হাত, সারাক্ষণ উচ্চকিত।
>
> পলাতক : কাজ চাই আপনার, না?
>
> তরুণ : এই বয়সে আমার পক্ষে কাজ চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।[৭১]

পড়ালেখা শেখা তরুণ মূলত পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার সংকটের শিকার। তাইতো ভালো কাজ খুজলেও তাকে পুঁজিবাদী সমাজ ঠেলে দিতে চায় অন্ধকার জগতের দিকে। তরুণ মনে করত সন্তান জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি সন্তানকে অর্থব্যয় করে লেখাপড়া শেখানো বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তাই বলে সন্তানের নিকট

---

[৭০] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, দ্রষ্টব্য : সবিনয় নিবেদন, পৃ. ৫-৭

[৭১] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সে বৃদ্ধ বয়সে অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাবে না এমনটি নয়। তরুণের বাবা শিক্ষিত কিন্তু অর্থনৈতিক দুর্বলতা তথা চারিদিকের অন্যায়, অবিচার দেখে সে হতাশা গ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠিকমতো বাড়িভাড়া দিতে পারছেন না। বাড়িওয়ালার সাথে ভাড়া দেওয়ার নামে মিথ্যা অভিনয় করছে। শিক্ষিত ছেলে তরুণ বেছে নিয়েছে হাইজ্যাকের পথ। তখনকার বাস্তব সমাজে এটি ছিল নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার-

> তরুণ : হাইজ্যাক? কোথায়? আপনি ভুল করছেন। আমি হাইজ্যাকার নই।
>
> পথচারী : বললেই হল হাইজ্যাকার নই ? ঠিক যেমন শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি তেমনি-
>
> তরুণ : তেমনি কি ?
>
> পথচারী : তেমনি বয়স তেমনি চেহারা।
>
> তরুণ : এই বয়সটা কি শুধু হাইজ্যাকার হবার?[৭২]

পারিবারিক অভাব অনটন, বেকার জীবন, সামাজিক অস্থিরতা, যোগ্যতানুযায়ী কাজ না পাওয়ায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা জীবন নিয়ে হতাশ ছিল। অযোগ্য ব্যক্তিরা দুর্নীতি করে অর্থ আত্মসাৎ করে সম্পদের পাহাড় গড়ছেন অন্যদিকে সৎ ব্যক্তিরা দারিদ্রের কবলে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। যা সমাজব্যবস্থায় চরম ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বাবার বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈন্যদশা। বাবার হতাশার মধ্য দিয়ে নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন তৎকালীন জীবনচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। তিনি মূলত চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কেমন হওয়া উচিত ছিল আর বাস্তবে আমরা কেমন দেখছি। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মিলবন্ধন খোঁজার চেষ্টা

[৭২] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তরুণের পিতার সংলাপে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়-

> তরুণ : বাবা, অতগুলো টাকা কোন ভালো মানুষের পক্ষে উড়ানো সম্ভব নয়। আমি নষ্ট হয়ে যাব। আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে। বাপ হিসেবে গর্ব করার মত তোমার কিছুই থাকবে না।
>
> বাবা : গর্ব ? ভালো ছেলের গর্ব ? কি হবে ঐ গর্ব দিয়ে ? আমার পেটে ক্ষিদে, মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা। আমি পেট পুরে খেতে চাই। নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চাই। সেজন্য আমার টাকা দরকার। সে টাকা দিবি তুই। সারা জীবন যা রোজগার করেছি সব আমি তোর পেছনে ফেলেছি। টাকা ফেরত দে হারামজাদা।[৭৩]

সদ্য স্বাধীন দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণে দুই ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। একশ্রেণির মানুষের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে জীবনে অশান্তি নেমে এসেছিল। আরেক শ্রেণির মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করেছিল। বাবা চাকরি করে ছেলে মেয়েদের আদর যত্নে বড় করেছিলেন আজ বৃদ্ধ বয়সে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে ছেলেকে খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করছে, নিজ মেয়ের সম্মান ভুলে গিয়ে বাড়িতে দালাল ডেকে এনেছেন-

> তরুণ : জানো ও লোকটা কে ?
>
> বাবা : জানি, মেয়ের দালাল।
>
> তরুণ : ওকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দিলে ?
>
> বাবা : দিলাম।
>
> তরুণ : কেন ?

[৭৩] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

> বাবা : যার বাড়ি ভাড়া দেবার মুরোদ নেই, বুড়ো বয়সে যে শান্তিমত দু'মুঠো খেতে পারে না। যার ছেলে কাজ পেয়ে ঘরে টাকা আনতে পারে না, মেয়ের দালালকে ঘরে ডেকে আনা ছাড়া তার উপায় কি?[৭৪]

একদিকে ধনাঢ্য মহিলা তার অর্জিত বিপুল সম্পদ বাজে পথে উড়িয়ে দিয়ে কষ্ট পেতে চায়। নিজের ভাই রাজুকে অর্থবৃত্তের মধ্যে না জড়িয়ে, হিসেব করে টাকা দিয়ে হোস্টেলে জীবনযাপন করিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। অপরদিকে, বৃটিশ মডেলের গ্রাজুয়েট বাবা নিজের মেয়েকে বাজারে বিক্রি করে দিয়ে রোজগারের কথা ভাবছেন। *এবার ধরা দাও* নাটকে স্বাধীন দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদেরকে চরমভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। নাটকের সমাপ্তি লগ্নে তরুণের কণ্ঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়-

> আমি করজোড়ে মিনতি করছি, আপনারা আমাকে একটি সৎ পরামর্শ দিন.....আমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। একদিকে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে নিশ্চিত ধ্বংস। আমি ভলো থাকতে চাই। আপনারা আমাকে বাঁচান। আপনাদের একটা জেনারেশন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা কি তাকে হারিয়ে যেতে দেবেন? ধ্বংস হতে দেবেন?[৭৫]

তরুণের আকুতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটা সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করেছেন। ঘুণে ধরা সমাজকে আবার নতুন করে গড়তে গেলে নতুন প্রজন্মকেই এগিয়ে আসতে হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরে দেশের মধ্যে আধা-সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ''স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে পুর্নবাসন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার নামে কল-কারখানা ধ্বংস করার সরকারি উদ্যোগসহ এই সময়ে বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নটি বিতর্কিত করা হয়। আর একটি ব্যাপার ঘটতে থাকে নীরবে–মধ্যবিত্তের প্রসার ও তাদের জীবনসংকট বৃদ্ধি। নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের

---

[৭৪] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৭৫] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

এই ক্রান্তিকালে আবদুল্লাহ-আল মামুন *এবার ধরা দাও* নাটকটি মঞ্চায়ন ও প্রকাশ করেন।''[৭৬] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যখন পচন ধরতে শুরু করেছিল তখন একজন সমাজ সচেতন স্রষ্টা আবদুল্লাহ-আল মামুন প্রতিবাদ জানিয়েছেন নাট্য সংলাপের মাধ্যমে-

> তরুণ : আমি প্রমাণ করতে চাই, বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ইয়ংম্যান মানেই হাইজ্যাকার নয়, ব্যাঙ্ক লুট নয়, পরীক্ষার হলে বই খোলা নয়। আমি আরো প্রমাণ করতে চাই, অর্থই জীবনের শেষ কথা নয়। জীবনের অর্থ অনেক বড়, অনেক ব্যাপক।[৭৭]

নাটকে তরুণ চরিত্রের সংলাপের মধ্যে যে নীতি বাক্যগুলো শুনতে পাই তা যেন সদ্য স্বাধীন দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত হয়। স্পষ্ট করে লক্ষ করলে দেখা যাবে এ যেন নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুনের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে দেশে নতুন ভাবে নতুন মাত্রায় বৈষম্য সৃষ্টি হবে এটা কারোই কাম্য ছিল না। নতুন প্রজন্ম যে চেতনায় বড়ো হবে তার পথ হয়েছিল অমসৃণ। নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভিন্ন পথে চালিত করেছিল। নতুন প্রজন্মের প্রতি পূর্ব প্রজন্মের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্যের পাশাপাশি সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন সমাজগঠন করে পরবর্তী-প্রজন্মের জন্য সুখি-সমৃদ্ধ ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক দিক দেখাতে অগ্রজদের তাগিদ দিয়েছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ-আল মামুন।

সেনাপতি (১৯৮০) নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র রূপায়িত করে তুলেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী চেতনা তাঁর নাটকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি তাঁর

---

[৭৬] সৌমিত্র শেখর, 'আবদুল্লাহ-আল মামুনের নাটকে সমসময়', *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে* (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৭৭] আবদুল্লাহ-আল মামুন, *এবার ধরা দাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের উপজীব্য হয়েছে। সেনাপতি নাটকে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। তোষামোদ করে ধনাঢ্য মালিকের আস্থা অর্জন করে তার দুষ্টু বুদ্ধি দিয়ে কী করে মালিককে তার পরিবার ও শ্রমিকদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ভুল পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয় এক তোষামোদকারী সেনাপতি, এ নাটকে তারই কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এ মালিককে প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত হন, তাদের চারপাশের মানুষের কারসাজিতে তাঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফলে প্রকৃত অবস্থাটা তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তাঁদের আশপাশের মানুষগুলো সব কিছু ঠিক আছে বলে তাঁদের প্রবোধ দেন। *সেনাপতি* নাটকে শেষ পর্যন্ত মালিক প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সেনাপতির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবজীবনে তার প্রতিফলন খুব বেশি লক্ষ করা যায় না।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তাদেরকেও সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল একটা মধ্যবর্তী গোষ্ঠী। নিজের ব্যক্তি স্বার্থ সফল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। রাতারাতি অর্থ-বিত্তের মালিক হতে চাওয়া পরগাছা স্বভাবের শেকড়হীন সুযোগসন্ধানী মানুষ রাষ্ট্রপক্ষ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছিল। যা স্বাধীন বাংলাদেশে কারোই কাম্য ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভুলে গিয়ে এরা কাজ করতে থাকে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক। একজন সচেতন নাট্যকার হিসেবে আব্দুল্লাহ আল-মামুন বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে মানুষ কীভাবে বিবেকহীন হয়ে আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হতে পারে সে দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে *সেনাপতি* নাটকে। দ্রব্যমূল্যের ঊদ্ধগতির পেছনে যেমন কাজ করে মধ্যবর্তী গোষ্ঠী, তেমনি দেশের বিভিন্ন সংকট তৈরির পেছনে কাজ করেছে এক শ্রেণির স্বার্থকেন্দ্রিক গোষ্ঠী। *সেনাপতি* নাটকের ভূমিকায় আবদুল্লাহ আল-মামুন লিখেছেন-

> নাট্যচর্চাকে যেহেতু নিছক বিনোদন বা সময় কাটাবার তৎপরতা হিসেবে গ্রহণ করিনি, সেহেতু এক্ষেত্রে আমার কমিটমেন্ট, অপরিহার্য। এই প্রত্যয়ের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস সেনাপতি। আমি তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই কোনো না কোনো অবয়বে এই

Dhaka University Institutional Repository

> 'সেনাপতি' দের ভয়াবহ উপস্থিতি অনুভব করেছি এবং আতঙ্কিত হয়েছি এই ভেবে যে, বিশ্বের এই অংশের উৎপীড়িত বৃহত্তর গণমানুষের সামনে ওদের মুখোশ উন্মোচিত না করা গেলে অতি বিপজ্জনক পরিণতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।[৭৮]

সেনাপতি নাটকে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো একটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষা দিলে যেমন দৈত্য এসে হাজির শখের প্রদীপ আহরণকারী তেমনি হ্যারিকেনটা ঘষা দিলে হাজির হয় আব্বাস আলী তালুক্দার। সময়ের ব্যবধানে এখন আর দৈত্য আসেনা, আসে একজন আব্বাস আলী তালুকদার। শিক্ষিত, বিত্তহীন মধ্যবিত্ত। ঠিকমতো বাড়িভাড়া দিতে পারে না স্ত্রী মেরীর বেতনের ওপর নির্ভরশীল-

> শ.প্র.আ : আপনি কে?
>
> তালুকদার : আব্বাস আলী তালুকদার, এম. এ. এবং বিত্তহীন মধ্যবিত্ত।[৭৯]

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে জাতীয় কল্যাণে কোনোই ভূমিকা রাখতে পারে না, বরং তারাই পতিত হয় আত্মদ্বন্দ্বে এবং নানাবিধ সমস্যায়, আবদুল্লাহ আল-মামুন সে কথাই এ নাটকে বলতে চেয়েছেন। এ শ্রেণির মানুষ কাজ করতে চাইলেও উপযুক্ত কাজ না পেয়ে পেন্ডুলামের মতো দোদুল্যমানতায় ভুগছেন। বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া চাইতে আসলে সে ঠিকমতো ভাড়া দিতে পারে না-

> তালুকদার : আমার কাছে টাকা নেই।
>
> বাড়িওয়ালা : তাহলে আছে কি?
>
> তালুকদার : মাথা ভর্তি চিন্তা আছে, বুক ভর্তি জ্বালা আছে, পেট ভর্তি ক্ষুধা আছে।[৮০]

দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদের তোষামোদ করে এক শ্রেণির মানুষ সুযোগ সন্ধান করেছেন। সাধারণ শ্রমিক থেকে মালিক পর্যন্ত সকলের সাথে

---

[৭৮] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, মুক্তধারা, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, দ্রষ্টব্য : ভূমিকা

[৭৯] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৮০] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বেঈমানী করছে। আন্তরিকতার অভিনয় করে সুযোগ বুঝে অন্তর জ্বালিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে স্নেহ, ভালোবাসা, বিশ্বাস, দেশপ্রেম, জলাঞ্জলি দিচ্ছে। আব্বাস আলী তালুদকার সাধারণ শ্রমিকদের সাথে মালিকের বৈষম্য তৈরি করেছে। এরকম বৈষম্য নাটকে নাট্যকার লাঘব করতে পারলেও বাস্তবজীবনে কতটুকু সম্ভব তৎকালীন ইতিহাস অবলম্বন করে অনুভব করা যেতে পারে।

সেনাপতি নাটকে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট উল্লেখ করতে গিয়ে আবদুল্লাহ আল-মামুন রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। শিক্ষিত কিন্তু সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত চরিত্র তালুকদার ওরফে সেনাপতি নানা কৌশলে মালিক স্যার চরিত্রটিকে শ্রমিকদের কাছ থেকে দূরে রেখে তাকে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে দেয় না। ফলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয়। সেনাপতি শ্রমিকদের বুঝিয়েছেন-

> তালুকদার : আরে, মালিক মানেই হলো চামার বদমাশ এইসব। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয় সেভাবেই। ঠিক আছে, এখন থেকে এসব ভাবনা-চিন্তা সব আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দিন।[৮১]

অন্যদিক মালিক স্যারকে বুঝিয়েছেন-

> তালুকদার : কে বলেছে আপনি মালিক? মালিক তো হচ্ছে সিস্টেম। এসটাবলিশমেন্ট। আপনি তো একটা সিস্টেমের আণ্ডারে কাজ করছেন, একটা এস্টাবলিশমেন্ট টিকিয়ে রেখেছেন-কেননা একজন লয়াল সিটিজেন হিসাবে আপনি সিস্টেম এবং এস্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতা করতে পারেন না।[৮২]

তালুকদার চরিত্রটি শুধু মালিক শ্রমিকের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেননি সেই সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেছেন মালিকের পরিবারের মধ্যেও। একমাত্র মেয়ে এবং ঘরজামাইকে বাড়িছাড়া করেছেন। সুযোগ সন্ধানী তোষামোদী স্বভাবের চরিত্রগুলো সুযোগ পেলে ভেতরে বাইরে সবদিকেই আগুন লাগাতেও পিছপা হয় না।

---

[৮১] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৮২] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তালুকদার নিজেও পারিবারিকভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তার অপরাধ ও অপকর্মের কারণে স্ত্রী মেরি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। যে তালুকদার অর্থের অভাবে একদিন বাড়িভাড়া দিতে পারেনি সে আজ অনেক সম্পদের মালিক। একসময় স্ত্রীকে সন্দেহ করলেও বলতে পারেনি আজ যখন অনেক টাকার মালিক হয়েছে তখন সন্দেহের কথা বলছে-

> তালুকদার : যখন গরীব ছিলাম তখন কিছু বলিনি। শুধু দেখেছি। আজ আমি বাড়িওয়ালাকে সাতাইশশ টাকা দিয়েছি। আজ বলছি, আমার বাড়িতে থেকে ঐসব ছেনালীপনা চলবে না।
>
> মেরী : তুমি–তুমি আমাকে সন্দেহ কর!
>
> তালুকদার : করি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করি। স্ত্রীকে সন্দেহ করা এখন আমার একটি প্রধান বিলাসিতা।[৮৩]

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা অসহায় হয়ে পড়ে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এমনি একটি প্রতীকী চরিত্র আব্বাস আলী তালুকদার। যে সারাজীবন অবহেলিত হয়েছে আর্থিক সংকটের কারণে আজ সে অন্যকে অবহেলা করছে-

> তালুকদার :... অপমান করতে এত ভালো লাগে আমি আগে জানতাম না এখন জেনে গেছি-জেনে গেছি এবং মজা পেয়ে গেছি। কেন পাবো না? সারা জীবন নিজে অপমানিত হয়েছি। আমার চারপাশে এমন কেউ আছে, যে সুযোগ পেয়ে একবার অন্তত আমার গায়ে থু থু দেয় নি। মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি বেশ্যার দালালের মত ভদ্রলোকদের পাঞ্জাবীর আস্তিন ধরে টানাটানি করেছি। পেট ভর্তি ক্ষুধা নিয়ে নেড়ী কুত্তার মত ডাস্টবিনের চারপাশে চক্কর মেরেছি। শালার সিভিলাইজেশন! আমার পাছায় লাথি দিয়ে বুঝিয়েছে আমি একটা মিসফিট, উল্লুক, ভ্যাগাবন্ড। আমি রাজনীতি বুঝি না, অর্থনীতি বুঝি না, সমাজ নীতি বুঝি না। আমি যেন জীবনে প্রথম কমলাপুর স্টেশনে নেমে কোনোমতে গুলিস্তান পৌঁছে ভাবছি ওটাই বাংলাদেশ। এবার? এবার কোথায় যাবে বাবা সিভিলাইজেশন? বাবা রাজনীতি? বাবা অর্থনীতি?[৮৪]

---

[৮৩] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৮৪] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

সেনাপতি নাটকের শেষাংশে দেখা যায় তালুকদারের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেছে। মালিক তার বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে প্রশ্ন করলেও সে অনুতপ্ত হয় না। সে যে কাজগুলো করেছে তা তার করা উচিত ছিল স্বাভাবিক কাজ বলে মেনে নিয়েছে। মালিকের ফিরে যাওয়ার পথকে সে রুদ্ধ করে দিয়েছে। তালুকদারের কূটকৌশলের কারণে যে মেয়েকে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল আজ সেই মেয়ে, বাবা কে ফিরিয়ে নিতে এসেছে- ''বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতদিন আমি যে পথে ঘুরেছি, সেই পথে তোমাকে নিয়ে যাবো বাবা।''[৮৫] প্রাসাদের জীবনে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। ঐ পথের দুপাশে ছড়িয়ে আছে জীবন। সম্পদ যে জীবনকে সুখ দিতে পারে না এ বিষয়টি শিল্পপতি স্যার বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে শ্রমিক নেতা সিধু ভাইয়ের নেতৃত্বে আব্বাস আলী তালুকদার মৃত্যুবরণ করে। শত্রু নিজ থেকে বিলুপ্ত হয় না। স্বেচ্ছায় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে নামে না।

শ্রমিক নেতা সিধু ভাইয়ের এই সংলাপ এবং শখের প্রদীপ আহরণকারীর সংলাপ-

> যদি কোনোদিন আমার সহকারী একটা মরচে ধরা ভাঙ্গাচুরা হ্যারিকেন খুঁজে পায়? সেই হারিকেনে ঘষা দিলেই যদি আমাদের মাঝে উদয় হয়, আরেকজন আব্বাস আলী তালুকদার? তাই, বহুদিনের পুরোনো হবি পরিত্যাগ করে আমি নতুন হবির সন্ধানে আছি।[৮৬]

নাটকের শেষাংশের এই সংলাপ থেকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন উন্নয়নশীল বাংলাদেশ থেকে সেনাপতিদের অর্থাৎ তালুকদার রূপি চরিত্রদের মুখোশ উন্মোচন করে বিতাড়িত করতে না পারলে দেশের উন্নয়নের গতি সুষম হবে না বলে নাট্যকার বিশ্বাস করেছেন। ''অবিশ্বাস নয় বরং একে অপরের প্রতি আস্থার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সব ধরনের অনিয়ম বন্ধ করতে সক্ষম। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক দুরাচার প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির ওপর আস্থা

[৮৫] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৮৬] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সেনাপতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন।"[৮৭] যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা তা দেশের অভ্যন্তরের কিছু সুযোগ সন্ধানি ব্যক্তি স্বার্থবাদি চরিত্রের কারণে বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে। দেশের নেতারা সমাজসেবা মূলক কাজ করতে চাইলেও অনেক সময় মুখোশ পরা তালুকদার রূপি চরিত্রের কারণে বাস্তবায়ন করতে পারে না। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ছদ্মবেশি সুবিধাভোগিদের চিহ্নিত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। *সেনাপতি* নাটকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে সুযোগ সন্ধানী তালুকদার, তেমনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা বিরোধি অপশক্তি বারবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। সরকার ও আমজনতার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে, কালোবাজারি করেছে, শেয়ার বাজার ধ্বংস করেছে, ব্যাংকের টাকা লুট করেছে, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে। সুযোগ সন্ধানী এসব চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর সেনাপতি নাটকে।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের রচিত *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪) কে অনেকে শ্রেষ্ঠ নাটক বিবেচনা করেন। আমাদের আলো-ঝলমল শহরের পাশাপাশি বস্তি এলাকায় যে বিরাট সংখ্যক মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে তাদের নিয়ে রচিত হয়েছে এ নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র বাক্কা মিয়া এক পঙ্গু ড্রাইভার। সেও একদিন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ স্ত্রী কান্দুনীর রোজগারের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করতে হয়। বস্তির ঘরে দিনরাত শুয়ে শুয়ে দেখে চারপাশে কী ঘটছে। আর দর্শকের সামনেও উন্মোচিত হয় এক বিচিত্র জগত। সমাজের নানা অবক্ষয়ের চিত্র দেখতে পান দর্শক। গ্রাম থেকে আসা বাক্কা মিয়া ভাবে ঘর-বাড়ি, জমি-কোদাল এক সময়ে তার সবই ছিল কিন্তু আজ সে সব খুইয়ে পঙ্গু। এই পচে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ইচ্ছা জাগে

[৮৭] মোহাম্মদ শামসুল আলম, 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে এপিগ্রাম একটি পর্যালোচনা', *ভাষা-সাহিত্যপত্র*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, (সম্পাদক : অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি), ৪১তম সংখ্যা, ২০১৫, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

তার মনে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ স্বপ্নদৃশ্য হয়েই থেকে যায় তার জীবনে। তার জীবনে সে ব্যর্থ হলেও অন্যদের পথ দেখায় সমবেত প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই।

এখনও ক্রীতদাস নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন দেখিয়েছেন অদৃশ্য শোষকের বিরুদ্ধে বস্তিবাসী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের কাহিনী। তিনি মনে করেন, কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনো কৌশলে আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে এখনও ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। নাটকে এই ক্রীতদাস বানানো শোষকশক্তির বিরুদ্ধে নাট্যকারের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিতে কাজী আবদুল মালেকের ষড়যন্ত্রে নিহত বাক্কা মিয়ার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে নাট্যকারের দৃষ্টিকোণে আভাসিত হয় এই ইঙ্গিত : আসলে কাজী আবদুল মালেকেরা কখনও মরে না। মরে বাক্কা মিয়ারা। তবু এই বাক্কা মিয়ারই ভবিষ্যতের হাতে একটা স্বপ্ন রেখে যায়। স্বপ্ন প্রতিরোধের, প্রতিশোধের এবং চূড়ান্ত প্রতিবিধানের।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও অনেকে স্বাধীনতার পরে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে লজ্জিত হননি। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার সময় প্রতিপক্ষের গুলিতে পা হারিয়েছে বাক্কা মিয়া। সে মিথ্যাকরেও বলেনি যে সম্মুখ সমরে পা হারিয়েছে। সত্য কথা স্বীকার করেছেন, হারেস বাক্কা মিয়াকে যখন বলে দ্যাশ স্বাধীনের যুদ্ধে খানেগো লগে ফাইটিং করতে গিয়েই তো তুমি একখান ঠ্যাং হারাইছ। জবাবে বাক্কা মিয়া বলেছে তুমি যা যান সেটা মিথ্যা কথা। একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিকের মনোভাব ব্যক্ত হয় নিচের সংলাপের মধ্যদিয়ে-

> বাক্কা : মিছা কমু না। আমি টেরাক লইয়া দিনাজপুরে গেছি খ্যাপ মারতে। মাল খালাশ করছি কি করি নাই, খবর আইলো ঢাকা থিকা খানেরা আইসা পরছে। টাউনের একপাল জুয়ান মর্দ পোলাপান ফাল দিয়া উঠল আমার টেরাকে–কইল, চলেন মিয়াবাই বডারের ওপার দ্যাশ স্বাধীন করতে হইবো। আমারও শালা কোইত– থিকা জানি জোশ আইয়া পরল। ছুটাইলাম পঙ্খীরাজ। বেশি দূর যাইতে পারলাম না। বেদম গোলাগুলির মইদ্যে

Dhaka University Institutional Repository

> ফাইসা গেলাম। যখন হুশ হইল, দেখলাম চিত্তর হইয়া পইরা রইছি গাতার মইদ্যে। শালারা গুল্লি মাইরা আমার শইলের পুরা এক সাইড ঝাঝরা কইরা ফালাইছে।[৮৮]

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করা দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। এদিক বিবেচনা করে বলা যায় বাক্কা মিয়া স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে চারদিকে শুরু হয় অবক্ষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে গিয়ে ব্যক্তি লোভে পতিত হয়ে দেশ, সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ জলাঞ্জলি দিয়ে এক একজন হয়ে উঠে কালোবাজারি, ঘুষখোর, নারীপাচারকারী। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা মূল্যায়ন পাননি। তারা পতিত হয় সমাজের নিম্নস্তরে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া আর হারেসের কথাপোকথনে-

> হারেস : তাইলেই দ্যাহ তুমি মুক্তিবাহিনীর থিকা কম কি? গুল্লি মার নাই, কিন্তু গুল্লি খাইছ, তুমিই ত বাক্কা মিয়া আসল মুক্তিবাহিনী।
>
> বাক্কা : আসল মুক্তিবাহিনী? অই শালা বেক্কল, আমি যদি আসল মুক্তিবাহিনী হই তাইলে দ্যাশে জাগা পাই না ক্যান? ঘর নাই ক্যান? বাড়ি নাই ক্যান? বাপদাদার ভিটা গ্যালো কই? একখান ঠ্যাং লইয়া গলাচিপা বস্তির মইদ্যে ঘাউয়া কুত্তার মতন কাইমাই করতাছি। মায়ে ঝিয়ে মিল্যা আমারে বান্দর নাচ নাচাইতাছে।[৮৯]

পঙ্গু বাক্কা মিয়া স্বাধীনতার পর গলাচিপা বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। তার স্ত্রী কান্দুনি সাহেবদের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। মেয়ে মর্জিনা সিনেমায় অতিরিক্ত মেয়ের কাজ করে। স্ত্রী কন্যার উপার্জনে বাক্কা মিয়ার কখনো ক্ষুধা নিবৃত হয় না। স্ত্রী ও কন্যার গলগ্রহ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাকে। বাক্কা মিয়াকে কেন্দ্র করে নাট্যকার আরো কয়েকটি চরিত্র নিয়ে এসেছে সেই সঙ্গে বস্তি জীবন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের সমাজ-চিত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল তা স্বাধীনতার অল্পদিনের মধ্যেই ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

---

[৮৮] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬৬

[৮৯] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে লাগল। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছিল। অর্থের জন্য তহুরনের মতো মেয়েরা বেছে নিয়েছিল শরীর বিক্রির মতো পথ। মর্জিনা সিনেমায় অতিরিক্ত মেয়ের কাজ করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতেই সম্ভ্রম হারায়-

> মর্জিনা : বাবাগো, অরা আমারে নষ্ট কইরা দিছে। আমি পইচ্যা গেছি। আমি বেহুশ হইয়া গেছিলাম। অরা আমারে------[৯০]

নাটকের বেশিরভাগ চরিত্রের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে দেশের বেশিরভাগ মানুষ কয়েকজনের হাতের দাসত্বে পরিণত হয়েছে। দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও দেশের অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি মেলেনি। জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে ফাইটার কী কাজ করে টিকে থাকবে তা ঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত, যদিও সে দাবি করেছে সিনেমায় সে ফাইট করে তবে ছিনতাই-রাহাজানি-গুণ্ডামি করাই ফাইটারের কাজ। ফাইটার না বুঝে মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে মর্জিনাকে তুলে দেয় নারী পাচারকারীদের হাতে। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত ফাইটার বুঝতে পারে সে ভুল করেছে তাইতো উদ্ধার করতে চায় মর্জিনাকে। মর্জিনাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পুলিশকে খবর দেয়। ফাইটার যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র থেকে সকল অশুভ শক্তির মূলউৎপাটন করতে চায়-

> ফাইটার : আমি খবর দিছি অরা আইজকা গলাচিপা বস্তি থিকা মাইয়া উডাইবো এই খবর পাইয়াই আমি পুলিশরে খবর দিছি। কিন্তু বুঝতে পারি নাই, পুলিশ আসনের আগেই শালারা মর্জিনারে–আমি যাই–যেমুন কইরা পারি মর্জিনারে আমি বাঁচামুই–মর্জিনা বারে বারে বেইজ্জত হইতে পারে না–ঘাউয়া কুত্তার–দল বারে বারে জিততে পারে না। জীবনে বহুত পাপ করছি। কমসে কম একটা–বার এক মর্জিনার ইজ্জত বাচাইয়া পাপের গাটঠিডা এট্টু হালকা করি। এই আপনের সইলডা ছুইয়া কইয়া গেলাম, ফিরলে মর্জিনারে লইয়া ফিরুম। আর তা না হইলে মইরা যামু।[৯১]

---

[৯০] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

[৯১] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ আল-মামুন তরুণ সমাজের অবক্ষয় দেখে শঙ্কিত হয়েছেন। তরুণ সমাজ যদি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে ব্যবহৃত হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হবে। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের পরিবর্তে দেশদ্রোহি মনোভাব কাজ করবে। *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে কাজী আবদুল মালেক দেশদ্রোহী, আদম ব্যবসায়ী, নারী লোভী ও পাচারকারী। সে বস্তিতে বাক্কা মিয়ার ঘরে আস্তানা গেড়ে অফিস চালায়, অর্থাৎ বস্তি থেকে নারী সংগ্রহ করে। ধর্মের অপব্যবহার সে করেছে। নারীদের ক্রীতদাসির মতো ব্যবহার করতে চায়। বাক্কা মিয়াকে কুমনিস্ট আখ্যা দেয় কাজী-

> কাজী : নাউজুবিল্লাহ। এই মিয়া ত দেহি পাক্কা কুমনিস্ট। নাঃ আর ত এইহানে থাকন যায় না। দৌড় দেওন লাগে। কমুনিস্টগো সঙ্গে সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থিকাই আমাগো ক্যাচাল।[৯২]

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে লেবাস পরিবর্তনকারী স্বার্থান্বেষী দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের ভয় পেতেন। মুক্তিযোদ্ধারা যে চেতনা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল, যদি তাদের মধ্যে সেই চেতনা আবার জাগ্রত হয় সেই ভয়ে তারা তটস্থ থাকত। তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে কাজী আবদুল মালেকের মতো লোকেরা ভিন্ন পথে চালিত করছিল এদের। মিছরির ছুরি স্বভাবের এসব লোক মুখে মধুর কথা বললেও অন্তরটা ছিল পাপের সাগর। মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া এসব বুঝত, তাকে ভয়ও পেত কাজী। কাজী বুঝেছিল বাক্কা মিয়া পঙ্গু বলে জোর প্রতিবাদ করছে না। তারপরও সুযোগ পেলে আবার জেগে উঠবে প্রতিবাদ করবে এসব অন্যায়, অত্যাচার আর জুলুমের-

> বাক্কা : অই খারান।
>
> কাজী : একখান ঠ্যাং আর একসাইড তাজা শইল লইয়া তুমি মিয়া যেই ফালাফালি কর, তুমার পুরা ইঞ্জিন ঠিক থাকলে তুমি ত মিয়া আসমান জমিন ভাইঙ্গা ছুটতা-লাইন ফাইন কিচ্ছু লাগতো না।
>
> বাক্কা : সেইডা বোজেন তাইলে?[৯৩]

---

[৯২] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন' , *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

চা-দে-টোস বিস্কুট দে-আমি চায়ের মইদ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া খামু। মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বাক্কা মিয়া স্মরণ করিয়ে দেয় ক্ষুধার কথা। একজন সরূপে ফিরে আসা বিপথগামী ফাইটারের মৃত্যু, তহুরুনের শরীর বিক্রি, মর্জিনার সম্ভ্রম হারানো, কান্দুনির বড় সাহেবদের বাসায় কাজ করা, কুঁজোবুড়োর অভাব, মাস্তান-১, ২, ৩, ৪, ৫ বস্তির ছেলে হয়েও বস্তিবাসীদের ওপর কাজীর লোক হিসেবে টাকার বিনিময়ে অপহরণ, খুন, অত্যাচার করানো যেন স্বাধীনতা উত্তর মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার সামিল। যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁদের জীবনে স্বাধীনতার সুফল আসে নি। রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি বরং তাদের সমাজের নিচু স্তরে পাঠিয়ে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করানোর দিকে ধাবিত করছে। একজন বাক্কা মিয়া যিনি পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে পা হারিয়েছেন তাকে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য স্ত্রী কান্দুনি ভিক্ষা করতে বলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন অনাহারে মারা যাবেন তবু ভিক্ষা করবে না এ ইঙ্গিত বাক্কা মিয়ার জবানিতে পাওয়া যায়-

> বাক্কা : .... আমিও কইয়া দিছি, জান গেলেও ভিক্ষা করতে পারুম না।[৯৪]

১৯৪৭ সালের পরে দীর্ঘ ২৩ বছর। পশ্চিম পাকিস্তানি গোষ্ঠীর যে অত্যাচার অবিচারের স্বীকার হয়েছে তারই প্রতিবাদ বাঙালি ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দিতে সক্ষম হয়েছেন। যে ধরনের অত্যাচারের প্রতিবাদ বাঙালি করেছে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আবার নতুন করে ভিন্নভাবে সুবিধাবাদি গোষ্ঠী নিরীহ, দরিদ্র মানুষদের জিম্মি করে একইভাবে নতুন উদ্যামে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অত্যাচার করতে শুরু করে। স্বাধীনতার ইতিহাস ভুলে গিয়ে তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল। *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে সেই চিত্রই প্রকাশিত করেছেন নাট্যকার। সমাজকে তথা সমাজের মানুষকে

---

[৯৩] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৯৪] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সেই সঙ্গে নারীর মর্যাদাহরণের মতো বিষয় স্থান পেয়েছে এ নাটকে। স্বাধীন বাংলাদেশে একজন পঙ্গু-মুক্তিযোদ্ধা পেট ভরে খেতে পারে না, মেয়ে মর্জিনার ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না, স্ত্রী কান্দুনিকে অভাবের কারণে তালাক দিয়ে রিকশাওয়ালা হারেস আলীর হাতে তুলে দিতে হয়। এরকম বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের সুফল প্রত্যাশী নাট্যকারকে দেখতে পাওয়া যায় *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে। যিনি দেখিয়েছেন বার বার পরাজিত হওয়া মানে এই নয় পরাজয়কে মাথা পেতে নেয়া। কাজীর দলবলের হাতে গুলি খেয়েও মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়া সুস্থ মানুষের মতো কাজী ও তার চেলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাজিত করে এবং কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদী সংলাপ-

> বাক্কা : বারে বারে কি আমিই গুল্লি খামুরে? একবার ঠ্যাং–এ, একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে? শালারা জানস, জানস তরা আসলে কী? লেম্বু-পচা লেম্বু। তগ মতন পচা লেম্বুতে এই দ্যাশ ভইরা গ্যাছে। অহনে তগো লেম্বুচিপা দিয়া খতম করতে হইবো।[৯৫]

বাক্কা মিয়ার এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যেন পচে যাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে একজন সাহসী মুক্তিযুদ্ধার প্রতিবাদ। মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবন বাজী রেখেছিল বাক্কা মিয়া তাদেরই প্রতিনিধি। যুদ্ধে তারা দেশ পেয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি পেয়েছে অপরিমেয় বিস্বাদ। স্বাধীন দেশে তারা আজও পরাধীন। বাক্কা মিয়ার মতো মুক্তিযুদ্ধার মাধ্যমে স্বাধীনদেশের পুরনো শত্রুদের ঘায়েল করতে চান আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশের যেখানে থাকবে সবার সমানভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার। তিনি নাটক রচনা করে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে যারা হানাদারদের দোসর ছিল স্বাধীন দেশে তাদের সদর্প পুনরুত্থান দেশের জন্য ভয়ানক। এ বার্তা দিয়ে জনগনকে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন।

---

[৯৫] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *এখনও ক্রীতদাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বাবু ও রানার রাজনৈতিক আদর্শগত পার্থক্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩) নাটকে আবদুল্লাহ আল-মামুন। বাবু শিক্ষকের ছেলে। বাবু ও তার স্ত্রী রাবেয়া সৎ পথে উপার্জন করে জীবন-জীবিকা নির্বাহের চেষ্টায় নিমজ্জিত। কিন্তু একই সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও রানা যুদ্ধোত্তর অস্থির রাজনৈতিক বাস্তবতায় অসৎ পথে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে খ্যাতি লাভ করে। নাট্যকার বাবু ও রানাকে সমকালীন সমাজের ভিন্ন দুই বিন্দুতে স্থাপন করে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্য-পরিণতিতে সততার জয় ঘোষণার মাধ্যমে নীতিভ্রষ্ট মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাচক আদর্শে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

সৎ স্কুল শিক্ষক অবসর গ্রহণের পর বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছেলের চাকরি হবে, উপার্জন করবে। তাদের টানাটানির সংসারে ফিরে আসবে আর্থিক সচ্ছলতা। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনে ব্যক্তিমানুষ অনেকাংশে নীতিভ্রষ্ট ও অসৎ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীমহল এ সময় নীতিহীনভাবে বিত্ত-বৈভব গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এই নীতিহীনদের দলের একটি বিরাট অংশ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি। যেহেতু তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই তারা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার কাছে চাকরির জন্য ধরনা দিয়ে বাবু চাকরি পায়নি। পারেনি সংসারের হাল ধরতে। অথচ বাবুর বন্ধু রানা পরিবর্তিত সমাজ-বাস্তবতার সাথে নিজেও বদলে যায়। অসৎ রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ীদের সাথে গড়ে তোলে সুসম্পর্ক। তবে মুক্তিযোদ্ধা রানা সমাজের এই অসৎ মানুষগুলো সম্পর্কে মনে মনে ঘৃণা পোষণ করে। এজন্যই তাকে বলতে শোনা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

> হাত না মেলালে যে আমিই আগে ভাগে মরে যাই। আমি মরে গেলে ওদের মারবে কে? বুঝতে পারছিস না, ওরা হচ্ছে আমাদের এই লড়বড়ে পচা সমাজটার মাথা বুক পেট কোমর। ওদেরকে আমি ঢালের মত ব্যবহার করি।[৯৬]

অর্থাৎ রানা সময়ের স্রোতে মিশে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বুকের সাহসকে পুঁজি করে অসৎ শিল্পপতি, কালোবাজারি ব্যবসায়ী ও ধূর্ত-ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে পা দিয়ে অর্থ-উপার্জনের অসৎ পথ বেছে নিয়েছিল। এতে রানা বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানসিক শান্তি পায়নি। রানার যন্ত্রণাদগ্ধ কাতর উচ্চারণ-

> বুদ্ধি হবার পর থেকেই শুনে আসছি, সমাজে ঘুণ ধরেছে, এই সমাজ দিয়ে আমাদের চলবে না, এই সমাজকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে হবে–কিন্তু বিল্লীর গলায় ঘন্টা তো কেউ বাঁধে না।[৯৭]

আদর্শবান পিতার আদর্শ পুত্র বাবু সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু রানা ঘুণে ধরা সামজের স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। বাবু ও তার স্ত্রী রাবেয়া মিলে চাকরি করে সৎ পথে থেকেই জীবিকা উপার্জন করতে চেয়েছে। অথচ রাবেয়া চাকরি করতে গিয়ে লম্পট কাশেম আলীর অফিসে অপমানিত হয়। তারা কাশেম আলীর অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। কারণ, কাশেম আলীরা সমাজের প্রভাবশালী বিত্তবান। কাশেম আলীর যৌন হয়রানির পরও রাবেয়ার কণ্ঠে শোনা যায় আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা। তাই স্বামীর বন্ধু রানাকে উদ্দেশ্য করে রাবেয়া বলে :

> তুমি এখন আমার স্বামীর একজন পয়সাওয়ালা বন্ধু, সেখবর আমি পেয়েছি। ইচ্ছে করলে তুমি বাবুকে টাকার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারো। কিন্তু তোমার কাছে আমার

---

[৯৬] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৭

[৯৭] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

> একটাই অনুরোধ, তুমি বাবুকে নষ্ট করোনা। তুমি নিজে নষ্ট হয়ে গেছো তুমি আরো নষ্ট হও–তুমি টাকার পাহাড় গড়ে তোলো–বাবু যা আছে ওকে তাই থাকতে দাও।[৯৮]

বন্ধুর স্ত্রীর এই ঘৃণায় রানার হৃদয় রক্তাক্ত হয়। আত্ম-যন্ত্রণাদগ্ধ রানার হৃদয়ের এই গোপন রক্তক্ষরণ দারুণতর হয়ে ওঠে রানা-মনির প্রেমের সম্পর্কে। ভালোবেসে বাবুর বোন মনিকে রানা বিয়ের কথা বললেও মনি নীরবে প্রস্থান করে রানার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছুড়ে দেয়। মনির উপেক্ষা ও ঘৃণায় রানার বিত্ত-বৈভবের জাগতিক জীবন বিষিয়ে ওঠে। মনির উপেক্ষা, বন্ধুর স্ত্রীরির করুণামিশ্রিত ঘৃণার আগুনে রানার হৃদয় জ্বলেপুড়ে ছাই হয়েছে। অথচ সে তার রক্তাক্ত হৃদয়ের মানসিক যন্ত্রণার কথা কাউকে বলতেও পারেনি। সম্ভবত এ কারণেই রাবেয়ার সামনে ব্রিফকেস ভর্তি অসৎ পথে উপার্জিত টাকায় আগুন জ্বালিয়ে রানা প্রমাণ করতে চেয়েছে টাকা কিংবা বিত্তের চেয়েও বড় কিছু তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্য একদিকে রানার জীবন তছনছ করে দেয়, অন্যদিকে বিত্তের অভাবে স্কুল শিক্ষকের সংসার নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে সমাজ-বাস্তবতায় সৎভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের করুণচিত্র অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

> বউমা, তুমি তো পরের বাড়ীর মেয়ে-তুমি আমার সন্তান নিয়ে দুর্ভাবনা করছো। এতে আমার খুশী হওয়া উচিত বোধ হয়-ত খুশী আমি হচ্ছিও। মনি আমার নিজের সন্তান। কাজেই পুরো প্রসংগটাই বড় নাজুক-আমি তো চোরের মত ঘাপটি মেরে পড়ে আছি-পিতার অস্তিত্ব নিয়ে দুরন্ত দুর্বৃত্ত সন্তানের দিকে তেড়ে যাবো, সে শক্তিই বা কোথায়, মর্যাদাই বা কোথায়? সব তো কেড়ে নিয়েছে। তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে কারা, কারা কেড়ে নিয়েছে? উত্তরটা আমি জানি; কিন্তু বলব না। ভয়ে বলব না। কারণ বাঁচার সাধ কি জীবিত মানুষের সহজে মেটে? অতএব টিউশনী খোঁজাই শ্রেয় বোধহয়।[৯৯]

সৎ স্কুল শিক্ষক এখন সমাজের দুর্বৃত্তদের নাম মুখে উচ্চারণ করতে ভয় পান কারণ তাঁর বেঁচে থাকার সাধ আছে। দরিদ্র-নিরীহ স্কুল শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতার

---

[৯৮] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৯৯] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। কেননা সমাজের কর্তা ব্যক্তিরাই অসৎ, নীতিভ্রষ্ট এবং দুর্নীতিপরায়ণ। এরকম সমাজ-বাস্তবতায় সৎ স্কুল শিক্ষকের মতো ছা-পোষা মানুষের পক্ষে প্রতিবাদ অক্ষমের আর্ত-হাহাকার ছাড়া কিছুই নয়। আবদুল্লাহ আল-মামুন রানার অন্তর্দহনকে অত্যন্ত মেধাবী দক্ষতায় পরিবর্তিত সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন। রানার অসৎ পথে গড়ে তোলা বিত্ত-বৈভবের প্রতি সকলের ঘৃণা তাকে প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। আর তাই রানার কণ্ঠে শোনা যায়-

> রানা । আমি কি বেঁচে আছি? তুই কি মনে করিস আমি বেঁচে আছি?
>
> সুখে আছি?[১০০]

রানার এই বেঁচে না থাকার অর্থে নাট্যকার তার আদর্শচ্যুতিকে বুঝিয়েছেন। যে রানা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবুর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল পরবর্তি বাস্তবতায় রানার সেই বন্ধু বাবু তাকে 'স্বাধীনতার শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে রানা ভোগে আদর্শচ্যুতির যন্ত্রণায়। আদর্শবর্জিত রানা বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে প্রতিক্ষণ : সম্ভবত এই বিবেকের তাড়নায়-ই রানা শেষ পর্যন্ত মনিকে ফিরিয়ে দিয়েছে-

> মনি। তোমার তৈরী থাকার কথা ছিল। (একটু থেমে) মনে পড়ছে? আমি বাড়ী থেকে তৈরী হয়ে এসেছি। বিয়েটা হয়ে গেলে আমি আর ফিরে যাবো না।
>
> রানা। মনি, আমি তোমাকে বিয়ে করব, এমন কোনো কথা কি দিয়েছিলাম?[১০১]

রানা স্বেচ্ছায় জাগতিক সকল সুখ-ঐশ্বর্য উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির প্রয়াস পেয়েছে-

> বাবু। রানা, পালা রানা-পালিয়ে যা। পুলিশ-বাইরে পুলিশ, দেরী করিস না রানা। পালিয়ে যা।

---

[১০০] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[১০১] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

> রানা। কি করে পালাবো বল ? এত বছর পর যে পথ ধরে রাবেয়া এসেছে, তুই এসেছিস, সেই পথে পলাতকের পদচিহ্ন আমি আর রাখতে চাইনা। গত বছর গুলোতে জীবন থেকে পালিয়ে আমি তো কিছুই পাইনি। শুধু পাপের পেয়ালা পূর্ণ করেছি। বাবু, আজ কতবছর পর আমরা তিনজন আবার একখানে দাঁড়িয়েছি, ভাবতে পারিস? আমার জীবনটাও যদি তোদের মত হতো। কোনদিন হবে কি?[১০২]

অবশেষে বিবেকের কাছে পরাজিত রানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে অনুতাপের অনলে অন্তরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজেছে। নাট্য পরিণতিতে রানার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ মল্লিক, অসৎ ব্যবসায়ী কাশেম আলী এবং হেদায়েতুল্লা'র পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরিবর্তিত সমাজ প্রেক্ষাপটে রানা চরিত্রের অন্তর্দহনের মাধ্যমে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তি প্রজন্মের মধ্যে বিবেকের জাগরণ ঘটিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যুদ্ধচলাকালে যারা বিরোধীতা করেছিল তাদেরই একটা অংশ স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন ভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এদেরই একজন প্রতিনিধি হায়দার আলী। তাদের উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যাতে জাগ্রত হয়। নতুন প্রজন্মকে এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও তারা ফাঁদে ফেলে কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করছে। *তোমরাই* (১৯৮৮) নাটকে আছে মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুক্তিযুদ্ধের পরে পরিপ্রেক্ষিত গেল বদল হয়ে। ক্রমশ মুক্তিযোদ্ধারাই নিহত হয়েছে দালালদের হাতে, দালালরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, দৃঢ় করেছে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান। নতুন প্রজন্ম তথা তরুণ সমাজকে কী গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হচ্ছে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে *তোমরাই* নাটকে। মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর পর দালাল হায়দার আলীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তি। নিজের পরিচয় নিয়ে হায়দার আলীর কোন লজ্জাবোধ নেই, তাই অবলীলায় বিনা সঙ্কোচে বলে-

---

[১০২] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *আয়নায় বন্ধুর মুখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

> হায়দার : '..... বাজারে কি বেরিয়েছে ? একখানা বই ? কি নাম? একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়? বাঃ চমৎকার নাম। সেখানে আমার নাম ও আছে ? বাঃ বাঃ বড়ই দুর্লভ সম্মান। না না, লজ্জা হবে কেন? ইতিহাসে আমার নাম থাকছে। .....এত বছর পার হয়ে গেল, এখনও টের পাননি, দালাল ছাড়া দেশ চলে না।'[১০৩]

এ চিহ্নিত ব্যক্তি হায়দার আলীর চক্রান্তে নিহত হয় পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। অবশ্য হায়দার আলীকে খুন করে ফেলে তারই পদাশ্রিত ও ব্যবহৃত বিদ্রোহী তরুণ। *তোমরাই* নাটকের ঘটনায় পারিবারিক সংকট, অভাব, ষড়যন্ত্র বিষয়ের অবতারণা ঘটলেও মূলবিষয় হিসেবে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারীদের নতুন লেবাস, স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। রঞ্জু, হারান, শমসের, টোকন এদেরই প্রতিনিধি। যাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ব্যবহার করেছে ভুল পথে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা, মা, ননী ব্যানার্জী, মোবারক আলীর মতো লোকেরা চেষ্টা করছেন নতুন প্রজন্মকে আলোর পথে নিয়ে আসতে।

হায়দার আলী তার মেয়ে লুনার সাথে কথা বলতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে যে সে ঝোপ বুঝে কোপ মারে। মেয়েকে বুঝিয়েছে দালালরা যখন যে ক্ষমতায় থাকে তখনই তাকে বাপ ডাকে। তাদের তোষামোদ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করে। প্রধানত মেজরিটি অর্থাৎ জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা ছিল এই হায়দার আলীদের কাজ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত না করে বরং তরুণদের ভুলপথে চালাচ্ছে একাত্তরের ঘাতক দালালেরা। তারা চেয়েছিল তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃত রূপ শোনাতে। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ যোগ্যতা থাকার পরেও কাজ পায়নি। তাইতো তারা দিশেহারা, উদভ্রান্ত, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে একাত্তরের শত্রুরা।

---

[১০৩] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

নতুন প্রজন্মের যেসমস্ত তরুণরা দেশকে নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতো তাদের নিয়ে হায়দার আলিদের ভয়। শমসের, হায়দার আলির মতো যুদ্ধাপরাধীর কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে না চাইলে শমসেরের ওপর অন্যদের নজর রাখার কথা বলে। হায়দার আলীর মেয়ে লুনা যখন রঞ্জুর হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে বলল, আপনার হাতে বোমা পিস্তলের চেয়ে ফুলটা ভালো মানাচ্ছে। হায়দার আলীর কাছ থেকে টাকা না নিয়ে যখন ফুল হাতে রঞ্জু চলে গেল তখন হায়দার আলির ভয়-

> হায়দার : ওর হাতে আবার ফুল ধরিয়ে দিল কে? আজ ফুল ধরছে। কাল গেয়ে উঠবে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে'। হয়ে গেল বুঝি আমার বাঁশ।[১০৪]

স্বাধীনতার এই শত্রু হায়দার আলী চায় না দিশেহারা নতুন প্রজন্ম দেশকে ভালোবাসুক। দেশের প্রতি মমতা দেখাক। স্বাধীনতাত্তোর দেশে মুক্তিযোদ্ধারা তেমন সুযোগ সুবিধা না পেলেও তাদের মধ্যে একধরনের আত্মতৃপ্তি কাজ করছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর যখন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্মৃতিচারণ করছে তখন ননীবাবুর দোকানের পলা বলেছে এত কিছু করে কী লাভ হলো? পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর বলেছে দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে, বুক উঁচু করে হাঁটে, রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায় একথায় প্রমাণিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করাটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের মানুষ শান্তিতে আছে এটাই তাদের প্রাপ্তি। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা নীতিভ্রষ্ট হয়নি। তারা অভাবে অনটনে থাকলেও রাজাকার দালালদের কাছে হাত পাতেননি। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলী মুক্তিযোদ্ধা ননীদার কাছে নতুন ক্র্যাচ বানিয়ে দেবার দাবি করেছেন কিন্তু রাজাকার দালালদের কাছে করেননি।

রঞ্জুর মুক্তিযোদ্ধা মা কান্তা যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন আজ দেশ স্বাধীন হবার পর দেখছেন তার উল্টো চিত্র। তার ছেলে আজ হায়দার আলীর মতো স্বাধীনতার পুনর্বাসিত শত্রুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যে হায়দার আলী দাবার গুঁটির মত রঞ্জুকে

---

[১০৪] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে খেলছে। রঞ্জুর বয়সী ছেলেগুলোর ব্রেন ওয়াশ করে চলেছে, যেন এই জেনারেশনটা ভুলে যায় এদেশে একদিন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তোলার জন্যই এরা নতুন প্রজন্মকে বেছে নিয়েছিল। কখনো আবার অসহায় দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও তারা খুঁজে নিয়েছিল, দেশদ্রোহীমূলক কাজ করাতে। একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করতে পেরে আনন্দিত হতো হায়দার আলীর মতো দালাল রাজাকাররা।

নতুন প্রজন্মকে নষ্ট করতে তথা বিপথগামী করতে স্বাধীনতা শত্রুরা দিনরাত কুটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে অপরদিকে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধারা। নতুন প্রজন্ম যেন বিপথে চলে না যায় দেশকে ভালোবাসে, দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে সেদিকটা নিয়ে কাজ করেছে সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা। এ যেন স্বাধীন বাংলাদেশে আর এক নতুন যুদ্ধ। যার প্রমাণ আমরা মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জি ও রাজাকার হায়দার আলীর সংলাপে খুঁজে পাই-

> হায়দার : কি দেখছেন ননীবাবু? নিউ জেনারেশন? দেখুন, ভালো করে দেখুন। এরা এখন আমাদের সৈন্য। প্রয়োজন পড়লে এরাই আপনাদের মোকাবেলা করবে।
>
> ননী : আপনিও জেনে রাখুন, এরা আমাদের সন্তান। একদিন না একদিন এরা ঘরে ফিরবেই।[১০৫]

মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জী নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মানসে তাদেরকে যুদ্ধের কথা বলে সঠিক ইতিহাস জানাতে চায়। কারণ তরুণ সমাজ এখন খুন করা থেকে শুরু করে বোমাবাজি-ছিনতাই পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পা হারানো পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলীকে দেখিয়ে বাবলুকে স্বাধীনতার মানে বোঝাতে চাইলে সে দেখল সব হারিয়ে একজন ল্যাংড়া ভদ্রলোক, ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেশ ওর ঋণশোধ করছে না কেন? ননী বলল, তোমরা স্বাধীনতার মানে বুঝতে পারছ না বলে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

[১০৫] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কারণে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়ায় পুরো দেশ ওদের কাছে জিম্মি হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার চেতনা বিমুখ পরবর্তী প্রজন্মের যুবক হারানের কথায় এই ব্যর্থতার চিত্র পাওয়া যায়-

> হায়দার : স্বাধীনতার মানে যদি হয় সব হারিয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, তাহলে সেই স্বাধীনতার মানে আমাদের না বুঝলেও চলবে।[১০৬]

নতুন প্রজন্মের রঞ্জু হায়দার আলীর হয়ে কাজ করে। পূর্বপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জীর দোকান পর্যন্ত হায়দার আলীর হুকুমে তুলে দিতে চায়। এদের দোষ নেই কারণ এই রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি তাইতো কে শত্রু কে মিত্র তাদের চেনে না। যখন রঞ্জুর মা হায়দার আলীর সম্পর্কে বলে, সে একাত্তরে পাকিস্তানিদের হাতে রঞ্জুর বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। হায়দার আলীর ভয়ে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জি সাহায্য করেছেন, তখন রঞ্জু তার ভুল বুঝতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে এই তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো হয়নি বলেই অনেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হওয়ার পরেও মুক্তিযুদ্ধের শত্রু রাজাকার দালালদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল।

হায়দার আলীরা বুঝতে পেরেছিল যে ক'জন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছে তাদেরকে যদি প্রতিহত করা যায় তাহলে রাজ্য ও রাজত্ব দুইই পাওয়া যাবে। তাইতো সে উৎখাত করতে চায় ননী ব্যানার্জির দোকান, মেরে ফেলতে চায় তাকে, পুড়িয়ে দিতে চায় স্বাধীনতার ইতিহাস তথা মুক্তিযুদ্ধের পতাকা। মুক্তিযোদ্ধা কান্তা বিস্মিত হয় কেন তার ছেলেরা পালিয়ে বেড়াবে, কেন তারা মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না-

> মা : ননীদা সাতচল্লিশ, বাহান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর, তারপরও আমাদের ছেলেদের পালিয়ে বেড়াতে হয়? কেন?
>
> ননী : ওটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমরা ওদের অবহেলা করছি। আমাদের কোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ওরা পায়নি। তাই ওরা দিশেহারা, দিকভ্রান্ত। আর এই

[১০৬] ' নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

> সুযোগটাই লুফে নিয়েছে হায়দার আলীরা। হায়দার আলীদের এদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতেই হবে। একমাত্র পথ, অন্য কোনো বিকল্প নেই।[১০৭]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন *তোমরাই* নাটকে দেখিয়েছেন স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মকে কীভাবে স্বাধীনতা বিরোধিরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বিপথগামী করছে। এ নাটকে অবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদেরই জয় হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটু পরে হলেও ছড়িয়ে পড়েছে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। যে রঞ্জু হায়দার আলীর মতো দালালের হাতের পুতুল ছিল সে এখন বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পেরেছে। কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশদ্রোহী সেকথা বুঝতে পেরেছে। এজন্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্য সঞ্চারিত করার জন্য যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছিল তা করা হয়নি। বরং যুদ্ধ বিধ্বস্ত আর্থিক অনটনের সুযোগে রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনী নতুন উদ্যামে নেমে পড়েছিল দেশের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে।

হায়দার আলীই একাত্তরে রঞ্জুর বাবাকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আর মা কান্তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল হিংস্র পশুর মতো। সেই পরিবারের সন্তান রঞ্জু এখন পিতার হত্যাকারী রাজাকার হায়দার আলীর হুকুমের দাস। নির্দেশ তামিলকারী আজ্ঞাবহ ভাড়াটে গুণ্ডা। মায়ের নিকট থেকে রঞ্জু তার জীবনের অতীত কথা জানার পর হায়দার আলীর মুখোমুখি হয়ে একাত্তরের প্রকৃত ঘটনা জানতে চায়। একাত্তরের সত্য প্রকাশের সাহস কোনোদিনই ছিল না হায়দার আলীর।

অতঃপর হায়দারের সাথে রঞ্জুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। তবে রঞ্জু ফিরে আসলেও মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জির দোকান রক্ষা করতে পারে না। হায়দার আলী তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে পুড়িয়ে দেয় ননীর দোকান। আর পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আকবর নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে ননী ব্যানার্জিকে। নাটকের সমাপ্তির দিকে এসে দেখা যায় রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা জেনে উজ্জীবিত হয়েছে। সে প্রশ্নের মুখোমুখি করে হায়দার আলীকে-

---

[১০৭] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

> রঞ্জু : আমার বাবাকে পাকিস্তানি আর্মির হাতে ধরিয়ে দাও। আমার মাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়াও। ননীকাকার দোকানে আগুন লাগাও। পঙ্গু এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে গুলি চালাও। কেন? কি অপরাধ করেছে এরা?[১০৮]

নাটকের যবনিকায় দেখা যায় নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে ছড়িয়ে দিতে চান স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে চান নতুন প্রজন্মকে। কান্তা দর্শকের উদ্দেশ্যে বলেছে রঞ্জুরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। যারা যেভাবে পেরেছে ওদেরকে ব্যবহার করেছে। দর্শকের উদ্দেশ্যে মা আহ্বান করেছেন–''আকবরের হাতে ছিল যে স্বাধীনতার পতাকা, আসুন আমরা আজ সেই পতাকা তুলে দিই রঞ্জুদের হাতে।''[১০৯] আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বংশানুক্রমে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছেন। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ধারায় প্রবাহিত হোক, সোচ্চার হোক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, দেশের প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে *তোমরাই* নাটকে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনরূপ ইতিবাচক ভূমিকা না রেখেও প্রতারণার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে সুযোগ সুবিধা নিয়েছিল অনেকেই। এটা ছিল সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের সাথে সবচেয়ে বড় প্রতারণা। ভোয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দাপটে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হারিয়ে যেতে বসেছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার কাছে এর চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। ১৯৭১ সালে জীবন বাঁচাতে অনেকেই ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরেছিল মুক্তিযোদ্ধার মুখোশ পরে। মুখোশ পরা মুক্তিযোদ্ধাদের অপকর্ম সেই সঙ্গে আসল মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের দুরবস্থার ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮) নাটকের কাহিনী। লায়লার স্বামী জাফর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর স্বাধীন দেশে লায়লার নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। নিঃসঙ্গ লায়লা স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই জীবনের বাকিটা সময় পার করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি-

---

[১০৮] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

[১০৯] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *তোমরাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

> একদিন শ্বশুর বাড়ীতে সবাই মিলে আমাকে পরিয়ে দিল সাদা থান। আমি বুঝলাম, আমি বিধবা হয়েছি। তুমি মরে গেছ। শুনলাম তুমি নাকি শহীদ। তোমার আত্মদানে নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি যে তোমাকে হারালাম, স্বামী হারিয়ে আমি যে নিঃস্ব হলাম, এই বোধ তখন কারো মধ্যেই লক্ষ্য করলাম না। সবাই আমাকে নিয়ে মেতে উঠল। অবাক হয়ে গেলাম আমি। শহীদের বউ বলে আমার সে কি সম্মান। যেন স্বামী হারানোটাই আমার জন্যে মহৎ কাজ হয়েছে।[১১০]

লায়লার নিঃসঙ্গ-নিরুপদ্রব জীবনে আলী ইমাম উপদ্রব শুরু করে। নাট্যকার এখানে লায়লাকে স্বাধীনতার পক্ষের চরিত্র আলী ইমামকে স্বাধীনতার বিপক্ষের চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আলী ইমাম ও লায়লার বিরোধকে কেন্দ্র করে *তৃতীয় পুরুষের* কাহিনী গতি লাভ করেছে। নাট্যকার স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে ব্যক্তি-মানুষের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্র লায়লা-ইমাম চরিত্রের সহায়তায় চিত্রিত করেছেন।

লায়লার স্বামী জাফর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। একাত্তরে বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান বিরোধী কর্মতৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন জাফর। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার অপরাধে তাকে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহিদ জাফরের স্ত্রী হিসেবে লায়লা বিভিন্ন আলোচনা-সভা, শোক-সভা এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এসময় তাকে নানাভাবে সম্মানিতও করা হয়। অনেক নেতা তাদের বক্তৃতায় লায়লাকে আজীবন সম্মানী ভাতা প্রদানেরও ঘোষনা দেয়। শহিদ জাফরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শহীদ জাফর পাঠাগার' স্থাপনের প্রতিশ্রুতিও দেয় বক্তারা। অথচ স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে লায়লা দেখেছে, মঞ্চ কাঁপিয়ে যে নেতারা বছরখানেক আগে নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা সে কথা ভুলে গেছে। সবাই ভুলে গেলেও জাফরের স্মৃতি ভুলতে পারেনি লায়লা–

> লায়লা। বন্ধ কর.....বন্ধ কর ঐ হাত তালি। মিথ্যেবাদী, প্রবঞ্চকের দল। দেখাও আমাকে, এদেশের স্বাধীনতার কোন ইতিহাসে আমার স্বামীর নাম সোনার অক্ষরে লেখা

[১১০] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, কথন প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

> আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠাগারের নাম আমার স্বামীর নামে রাখা হয়েছে? শোক সভার ভাড়াটে বক্তার দল, তোমাদের অপমান, অবজ্ঞা আর অবহেলার বোঝা শেষ পর্যন্ত আমাকেই বইতে হয়েছে। তোমাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু যে শহীদ জাফর তার প্রয়োজন ফুরাতে বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু আমার জীবনে জাফরের প্রয়োজন কোনোদিন ফুরায়নি।[১১১]

মৃত স্বামীর স্মৃতির দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়েই লায়লাকে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজতে হয়। ঢাকা ছেড়ে চলে যায় কক্সবাজারে। অতঃপর সেখানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে তাকে ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে টিউশনিও করতে হয়। স্কুলের বেতন আর টিউশানির উপার্জনে কক্সবাজারে নিঃসঙ্গ লায়লা স্বামীর স্মৃতি নিয়ে একরকম ভালোই ছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার মুক্তিযুদ্ধে লায়লার স্বামী শহিদ হওয়ার পর সে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। স্বামী-শোকে বিপর্যস্ত-বিপন্ন লায়লা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল। তাই স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত ঢাকার বাড়ি ত্যাগ করে কক্সবাজারের নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছিল লায়লা।

আলী ইমাম যুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে এনিমি প্রোপার্টি দখল করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইমামের মতো সুযোগ সন্ধানীরাও স্বাধীনতার শত্রু। লায়লা ও ইমামের কথোপকথনে ইমামের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> লায়লা : ... ইমাম, স্বাধীনতার পর তোমার বন্ধু যদি বেঁচে থাকতো, আমি হলপ করে বলতে পারি, সে তোমাকে ক্ষমা করতো না। স্বাধীনতার সঙ্গে যে ইয়ার্কী তুমি করেছো, তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পেতে হতো।
>
> ইমাম : ... লায়লা, এতদিনে আমি আমার ভাগ্য গড়ে নিয়েছি। স্বাধীনতার আগের আমি আর স্বাধীনতার পরের আমি, এই দুইয়ের মাঝে অনেক ফারাক লায়লা।[১১২]

---

[১১১] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১১২] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

আলী ইমাম কিংবা তার মতো সুযোগ সন্ধানীরা এখন স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা তুলতে নারাজ। আলী ইমামেরা মহান মুক্তিযুদ্ধকে পুরোনো কাসুন্দি হিসেবে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত হয় না। যারা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে পুরনো কাসুন্দি বলে তুচ্ছজ্ঞান করে তারা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার শত্রু। অথচ আজ দেশ প্রেমিকের মুখোশ পরে আলী ইমামরা সম্মানিত হয়, কিন্তু শহিদ জাফরের স্ত্রীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য স্কুলে শিক্ষকতা ও টিউশানি করতে হয়। তবে লায়লা মনে করে আলী ইমামদের এই দৌরাত্ম সাময়িক; তাদেরকে একদিন বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি পেতেই হবে-

> লায়লা । আজ এতবছর পর এদেশের সাধারণ মানুষ যদি তোমাদের ঐ লুটের টাকার হিসাব চায়, দেখাতে পারবে?
>
> ইমাম । এতো পুরোনো কাসুন্দি। এত কাল পর এসব ঘেটে কোনো লাভ আছে?[১১৩]

লায়লা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে স্বাধীনতা যুদ্ধটা যদি সত্যি হয়, আমার স্বামীর মত আরো লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ যদি নিরর্থক না হয়, তাহলে তোমরা পার পাবে না। একদিন বিচার হবেই। লায়লার প্রত্যাশা নিয়ে প্রশ্ন অবান্তর। তবে স্বাধীনতার শত্রু আলী ইমামদের বিচার করবে কারা? জনতা কি পারবে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? উন্মোচিত হবে কি তাদের মুক্তিযোদ্ধা মুখোশের আড়ালের ভণ্ড চেহারা? কারণ নাট্যকার জন জীবনের বাস্তবতায় দেখেছেন স্বাধীনতার পরে এ দেশের বিপ্লবী সূর্য সন্তানেরা কিংবা জনতা ভুলে গেছে সংগ্রাম। জনতার কণ্ঠে আজ চাল ডালের হিসেব। চোখে মুখে অকাল মৃত্যুর ছায়া। এ জনতা আর জাগবে না। তাহলে কীভাবে আলী ইমামদের তথা স্বাধীনতার শত্রুদের বিচার হবে?

তৃতীয় পুরুষ নাটকের প্রধান চরিত্র লায়লা; নাটকের অন্য চরিত্রটি হচ্ছে জাফরের বন্ধু আলী ইমাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইমাম পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেও স্বাধীনতার পর ইমাম কৌশলে মুক্তিযোদ্ধার খেতাব অর্জন করে। আলী ইমাম সুযোগ সন্ধানী ধূর্ত প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর চরিত্র। এই মানুষটি একদিন লায়লার কক্সবাজারের

[১১৩] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সবাই যখন জাফরদের কথা ভুলে গেছে তখনো লায়লা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রিয়তম স্বামীকে অনুভব করছে। তাঁর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে স্বামীকে তথা এক শহিদ মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে লায়লা। এরকম পরিস্থিতিতে লম্পট আলী ইমাম দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে কক্সবাজারে হাজির হয়। বন্ধুর স্ত্রী লায়লার প্রতি আলী ইমামের প্রথম থেকেই একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ইমাম জানত, তার ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা নেই। তথাপি আলী ইমাম হাল ছেড়ে দেয় নি; লায়লার মন পাওয়ার চেষ্টা সে অব্যাহত রেখেছিল। জাফরের মৃত্যুর পর ইমাম ভেবেছিল, এবার তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নেই। কিন্তু আলী ইমাম এরপরও কোনোভাবেই লায়লার চারিত্রিক দৃঢ়তা ভাঙতে পারে নি। সবদিক থেকেই যখন ইমাম ব্যর্থ হয়েছে, তখন লায়লাকে খুন করে অপ্রাপ্তির প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে। একদিকে ইমামের সুপ্ত কামনা চরিতার্থ করতে না পারার যন্ত্রণা অন্যদিকে ইমামের স্বগোতোক্তি থেকে লায়লা জেনে যায় ইমামের প্রকৃত স্বরূপ। ইমাম তাই লায়লাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে জানিয়েছে, স্বাধীনতার শত্রুদের, যারা চিনে ফেলেছে তাদেরকে বাঁচতে দেবে না। তাই স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে লায়লা যখন ইমামকে চিনে ফেলে, তখন তাকে হত্যা করা ছাড়া আলী ইমামের গত্যন্তর থাকে না। এজন্যই ইমাম বলে-

> তুমি আমাকে অনেক অপমান করেছো। আমাকে তুমি চিনে ফেলেছো। আমরা যারা এখন এদেশে করে খাচ্ছি, তাদের যারা চিনে ফেলে তাদেরকে আমরা বাঁচতে দেই না। তাছাড়া তোমার তো জীবনে আর কোন আশা নেই, স্বপ্ন নেই।[১১৪]

আলী ইমাম শেষ পর্যন্ত লায়লাকে খুন করতে পারে না। ইমাম গলা টিপে ধরার পূর্ব মুহূর্তে লায়লা ছলনার আশ্রয় নিয়ে ইমামের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। লায়লার এই ছলনার ফাঁদে পড়ে ইমাম সহসা আত্মবিস্মিত হয়ে পড়ে এবং লায়লাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দেয়। ধূর্ত ইমামের এই বিশ্বাসবোধের মূল ভিত্তি প্রেম ও কাম। ছল করে ইমামের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে লায়লা বিয়ের আয়োজন উপলক্ষে বান্ধবীকে

[১১৪] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ দেওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এসময় আলী ইমাম দীর্ঘদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে পারার আত্ম-প্রসাদে নিজের কুকীর্তি একে একে রোমন্থন করতে থাকে। লায়লা বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বের হলেও পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইমামের কুকীর্তির কথা শুনে ফেলে। এবং পুলিশকে সংবাদ দেয়। অবশেষে স্বাধীনতার শত্রু খুনি আলী ইমাম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গ্রেফতার হওয়ার পর আলী ইমাম স্বীকার করে জাফরদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি-

> ইমাম। ইচ্ছে করলে আমি আত্মহত্যা করতে পারি। আমার এই ব্যাগে গুলীভরা পিস্তল আছে। কিন্তু আমি আত্মহত্যা করব না। আমি পুলিশের কাছে ধরা দেব। কেন জানো? (লায়লা কথা বলে না) আমি একটার পর একটা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছি। বন্ধু, দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সবার সংগে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাই আত্মহত্যা করার অধিকার আমার নেই। আত্মহত্যারও একটা আলাদা মর্যাদা আছে। সে মর্যাদা আমার প্রাপ্য নয়। আসি লায়লা। তবে যাবার আগে বলে যাই, আমার আজকের এই পরাজয় প্রমান করে দিল, জাফরের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। এদেশ জাফরের, ইমামের নয়।[১১৫]

কাহিনির সমাপ্তিতে নাট্যকার আকস্মিকভাবে আলী ইমাম চরিত্রে শুভ বোধোদয় দেখিয়েছেন। কারণ, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার আগে সামাজিক লজ্জার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে নিজের কাছে থাকা পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারত; কিন্তু আলী ইমাম তা করেনি। কিংবা পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেনি। এমনকি লায়লাকেও দোষী করেনি। উপরন্তু আলী ইমাম স্বীকৃতি দিয়েছে শহিদ জাফরদের আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে বলে। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে মানুষটি সারাজীবন দেশের সাথে, দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার আত্মহত্যারও অধিকার নেই। ধূর্ত আলী ইমাম চরিত্রের এ ধরনের পরিবর্তন আকস্মিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সিনেমাটিক হয়ে উঠেছে। *তৃতীয় পুরুষ* এ নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন লায়লা ও ইমামের অতীত স্মৃতিকথায় তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা উত্তরকালের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনবাস্তবতার সাথে মুক্তিযুদ্ধের আবেগের। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি আলি ইমামের ভুল বুঝতে পারা সেই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা জাফরের জয়গান গাওয়ার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে

[১১৫] আবদুল্লাহ আল-মামুন, *তৃতীয় পুরুষ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পরার সুযোগে অনেক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা আদর্শচ্যুত হয়েছেন। নীতি নৈতিকতা ভুলে গিয়ে হাত মিলিয়েছেন স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে। যাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এমনই একটা চরিত্র *বিবিসাব* **(১৯৯১)** নাটকের মুক্তিযোদ্ধা মেম্বার। যিনি সুবিধাবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি রাজাকার বসিরুদ্দিন মোল্লাদের মতো স্বাধীনতা শত্রুদের উত্থান এতটাই ঘটেছে যে তারা একজন নারী মরিয়ম ওরফে মইরাম বিবি যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বামী এবং দুই সন্তান আলা, ভোলাকে হারিয়েছেন তাকে ও সম্মান দেয়নি। একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী তথা একজন মুক্তিযোদ্ধার মায়ের সম্মান যেমন হওয়া উচিত ছিল স্বাধীন দেশে মরিয়ম বিবি তা পাননি। রাজাকার বসিরুদ্দি মোল্লার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে মরিয়ম বিবি। মুক্তিযোদ্ধার মাতা হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিলেন মরিয়ম বিবি। রিক্সার ভাড়া তুলে বস্তিতে বাস করে তার জীবন চলে যায়। অন্যের দয়া কিংবা অনুগ্রহ পেতে চাননি।

রাজাকার বসিরুদ্দি মোল্লা মইরাম বিবির পুরানো শত্রু। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যয়ে দেখা যায় স্বাধীনতা বিরোধীরা আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী। তাইতো অর্থের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বেগ পেতে হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদর-আলশামস বাহিনী যেভাবে মা-বোনের ইজ্জতের ওপর চড়াও হয়েছিল ঠিক একইভাবে স্বাধীন দেশে জমিরুদ্দির স্ত্রী রহিমার দিকে রাজাকার বসিরুদ্দি মোল্লার ছোট ছেলের কুনজর পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে একাত্তর সালের মুক্তিযোদ্ধা হাত মিলিয়েছে রাজাকার বসিরুদ্দি মোল্লার সাথে। মরিয়ম বিবির সাথে মেম্বারের কথোপকথন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

> মইরাম : স্বাধীনের পরে পরে আপনে ভাষণ দিছেন না, বসিরুদ্দি মোল্লা শান্তি কমিটির মেম্বর আছিলো অর দুই পোলা আছিলো বদর বাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশে অগো মা বাপ নাই .... দিছেন না এই ভাষণ?
>
> মেম্বর : তা দিছি।
>
> মইরাম : তাইলে?
>
> মেম্বর : অহনে দিনকাল অন্যরহম হইয়া গেছে বিবিসাব।
>
> মইরাম : দিনকাল অন্যরকম হয় নাই। অন্যরহম হইছেন আপনেরা, ক্ষ্যামতার নিশায় পাইছে আপনেগো। ক্ষ্যামতায় যাওনের লিগা আপনেরা আইজকা এই পাট্টি করেন, কাইলকা ঐ পাট্টি। আপনেরা মনে করেন পাবলিক কিছু বুঝে না।[১১৬]

শহিদ মাতা মইরাম বিবিকে দেখা যায় স্বাধীন দেশে মাথা নত করে নয় মাথা উঁচু করে তিনি বাঁচতে চেয়েছেন। স্বাধীন দেশে রাজাকারদের অপমান সহ্য না করে দলবদ্ধভাবে বস্তিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। নাটকের শেষ দিকে সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা মেম্বারের পালিয়ে যাওয়া সেই সঙ্গে বস্তিবাসীদের হাতে রাজাকার বসিরুদ্দি মোল্লার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির জয়গান গেয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল সব সময় আবদুল্লাহ আল-মামুনের। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বিবিসাব নাটকে ।

নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনায় সবসময়ই বাস্তবতাকে অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩) নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার

---

[১১৬] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *বিবিসাব*, অনন্য, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। *দ্যাশের মানুষ* এর মঞ্চ পরিকল্পনা সম্বন্ধে নাট্যকারের বক্তব্য হচ্ছে :

> মঞ্চের ঠিক মাঝখানে নয়, ব্যাকওয়ালের ঘেঁসাঘেসি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটি মিনি স্ট্রাকচার। তবে স্মৃতিসৌধটার অবস্থা বড়ই করুণ। পোড়োবাড়ীর মত এর কোনো দেখাশোনা নেই, আদর যত্ন নেই। রং চটে গেছে, ইটের গাঁথুনি বেরিয়ে গেছে। শরীরের এখানে সেখানে পরগাছা গজিয়ে উঠেছে। বর্তমানের বাংলাদেশে স্বাধীনতার যে বিবর্ণ চেহারা প্রায় সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারই নীরব প্রামাণ্য চিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই স্মৃতিসৌধ।[১১৭]

নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের মঞ্চ পরিকল্পনার মধ্যেই *দ্যাশের মানুষ* এর নাট্য ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জরা-জীর্ণ শহিদ স্মৃতিসৌধের সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশকে সমান্তরালে চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার অভ্যন্তরে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন নাট্যকার। উপরন্তু *দ্যাশের মানুষ* নাটকের মঞ্চায়নও সুনির্দিষ্ট দিনে বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসে করতে চান। ফলে এই প্রতীকী মঞ্চায়ন পরিকল্পনা আরো গভীর তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। নেতার সংলাপে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সেই তাৎপর্য : 'পাবলিকের ধাক্কাধাক্কি আর বিচিত্র সব আহ্লাদেপনা, একদম সহ্য হয় না। স্মৃতিসৌধে যে একেবারে ছাব্বিশে মার্চেই আসতে হবে এতকাল পরে এই সস্তা সেন্টিমেন্টের কোনো মানে হয় না। ছাব্বিশে মার্চের এই দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের কর্মী নেতাকে আশ্বাস দিয়েছে, আর কয়েক বছর বেঁচে থাকলে এই কষ্টটাও চলে যাবে। আসতেই হবে না। একদিন আগেও না পরেও না। যারা রাজনীতি করে এবং দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে সেই রাজনীতিবিদ এবং তার দলীয় কর্মীর দেশপ্রেমের নমুনা যদি এরকম হয়, তাহলে সত্যিই একদিন পলাশী প্রান্তরের মতো এদেশের স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একাত্তরে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনা ও মূল্যবোধ যদি এভাবে ক্ষয়ে যায়, তাহলে রাজনৈতিক কর্মীর উপরোক্ত কথা বাস্তবে পরিণত হতে

[১১৭] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

খুব বেশি বিলম্ব হবে না। দেশ ও রাজনীতির বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে নাট্যকার জানিয়েছেন-

> দেশ চালাচ্ছে ঐ যাদুর বাক্স। ওই হচ্ছে একাধারে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, অফিসার, বিজনেসম্যান, শ্রমিক, ছাত্র এবং পাবলিক। দেশে কিছু হোক না হোক ঐ যাদুর বাক্সের পর্দায় সবই হয়ে যাচ্ছে। এঁদো পচা পুকুরে পোনামাছ ছাড়া থেকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কিছুই বাদ দেয় না ঐ যাদুর বাক্স।[১১৮]

এখানে 'যাদুর বাক্স' বলতে বিটিভিকে বোঝানো হয়েছে। দেশে উন্নয়ন হোক আর না হোক টিভির পর্দায় ঠিকই উন্নয়নের জোয়ার ভেসে যাচ্ছে। অর্থাৎ রাজনীতিকরা বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল এই গণমাধ্যম ব্যবহার করে অবলীলায় অবিরাম সাধারণ জনগনকে ধোঁকা দিচ্ছে। নাট্যকার দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতিবিদগণের ধোঁকাবাজির মুখোশ উন্মোচন করে বলেছেন সবরকম ভেদাভেদ, ইজম টিজম নীতিফীতি ভুলে যেতে হবে। কিংবা আমাদের নীতি হবে এক ও অদ্বিতীয়। পাওয়ার। পাওয়ারে যাওয়া। এরকম রাজনৈতিক বাস্তবতায় শাসিত জনগণ গর্জেও উঠে না, রুখে দাঁড়ায় না, প্রতিবাদ করে না।

জনগণের এই নির্বিবাদ অসচেতনতায় ধূর্ত রাজনীতিকরা বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সদস্যরা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে নাট্যকার জানিয়েছেন রাজনীতি অর্থে আর জনগণের সেবা করা বোঝায় না, বরং রাজনীতিতে নিজের সেবা করাই প্রধান লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র-ক্ষমতা। সুতরাং ক্ষমতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে যেকোনো মূল্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। এদেশের রাজনীতিকরা এখন কোনো নীতি নৈতিকতা কিংবা আদর্শে বিশ্বাস করে না, তাদের কোনো মূল্যবোধ নেই। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদও অবলীলায় স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাথে হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

---

[১১৮] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের এই অবক্ষয়ের ফলে দেশে এখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্টিতে সয়লাব হয়ে গেছে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশে রাজনীতি করতে গেলে এখন আর নীতি আদর্শ লাগে না, লাগে না কোনো বিশেষ ইজম। এমনকি জনগণের কথা ভাবারও সময় নেই নেতাদের। এমতাবস্থায় দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি কতটা বিপন্ন তা বোঝার বাকি থাকে না। বাংলাদেশের নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মরিয়া; তাই নেতার ঘোষণা-

> স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ছাদের নীচে আসুন আমরা পলিটিশিয়ান, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, আলবদর সবাই একাকার হয়ে যাই।[১১৯]

এদেশের ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা আজ একই ছাতার তলে একত্রিত হয়েছে। ফলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অনেকে স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে আঁতাত করে। জোটের নামে জনগণকে ধোকা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয় সুবিধাবাদী রাজনীতিকগণ। যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন নিয়ে চলে ষড়যন্ত্র আর গোপন আঁতাত, তখন রহমতের মতো রাজাকার লাভ করে সামাজিক সুযোগ সুবিধা। একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে রহমত ভিটামাটি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়। বিধবা সাহানার ভিটামাটি জবর দখল করে নিতে চায় রহমত। রহমতরা মহান মুক্তিযুদ্ধকে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে স্বীকার পর্যন্ত করে না। একাত্তর সালকে বলে গণ্ডগোলের বছর। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বর্তমানে কতটা সামাজিক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অর্জন করলে স্বাধীন বাংলাদেশে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে অপমান করতে পারে। উপরন্তু সাহানাকে জবর দখলকারী রহমত মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে ব্যঙ্গোক্তি করে-

---

[১১৯] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

> আপনে তাইলে হইলেন গিয়া মুক্তিযোদ্ধার বিধবা। তবে তো আপনেরে আরেকটু কনসিডার করা যায়। এক সপ্তাহ না, পুরা দুই সপ্তাহ টাইম দিলাম আপনেরে। বাড়িটা ছাইরা দ্যান।[১২০]

স্বাধীন বাংলাদেশে রহমত আলীরা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী সাহানাকে ব্যঙ্গ করার সাহস পায় কিংবা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের শক্তি পায়, তা আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। একটু গভীরে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। রাজাকারদের এই শক্তির উৎস ও নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। জানিয়েছেন রহমত আলীদের শক্তির উৎস রাজনৈতিক শক্তি। তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের লোক। জোটগত ঐক্যের ফলে দিনে দিনে তাদের দলই স্ফীতকায় হয়ে উঠছে বেড়েছে তাদের কর্মতৎপরতা। যেখানে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ রাজাকারদের সাথে হাত মিলিয়েছে, সেখানে অসহায় বিধবা মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী সাহানা কীভাবে অপশক্তির বিরুদ্ধে একা লড়াই করবে? সমাজে রহমত আলীদের আস্ফালন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্ম্যের মুখেও সাহানা দৃঢ় কণ্ঠে মেয়ে রুনুকে বলে-

> আর কোনো দিন বলবি না, আমরা ওদের সঙ্গে পারবো না। আমি এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। তুই এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমরাই পারবো।[১২১]

তারা কীভাবে পারবে? এ প্রশ্নের উত্তর জটিল। কেননা সাহানার তো কোনো ক্ষমতা বা রাজনৈতিক পাওয়ার নেই। মেয়ে রুনুকে যতোই সাহানা অভয়বাণী শোনাক না কেন, প্রকৃত বাস্তবতা রুনু দেখেছে সাহানা পারেনি। বরং একজন রাজাকার সাহানার পরিবারকে সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। সাহানার জীবন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নাট্যকার বলতে বাধ্য হন, যায় যায় বাঙ্গালীর ভাগ্য চইলা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি নস্যাৎ হয়, অপাঙক্তেয় ও মূল্যহীন হয়, তাহলে মুক্তিযোদ্ধার কন্যা রুনুর ভীতি স্বাভাবিক। ভীতি নিয়েই বিপন্ন মানসিকতায় রুনু তার মাকে প্রশ্ন করে-

---

[১২০] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

[১২১] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

> মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তাতে কি হয়? বুঝি না মা। আমি তোমার কথা বুঝি না। তাতে কার কি আসে যায়?[১২২]

রুনুর প্রশ্নের কী জবাব দেবে সাহানা? অন্যদিকে এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা 'গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া' স্বরূপ। এরা বিভিন্নভাবে ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে সুযাগ-সুবিধা আদায়ে মগ্ন। ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী এই ধরনের জ্ঞান পাপীরাও আজ স্বাধীনতার হুমকিস্বরূপ নাট্যকার তা আসাধরণ কৌশলে তুলে ধরেছেন। এদেশের সাধারণ মানুষ যারা, তারা তাদের ভোটাধিকার পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারে না। তাদের পছন্দ মতো নেতৃত্ব খুঁজে নেওয়ার সুযোগও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে হারিয়ে ফেলেছে তারা। জনমানুষের এই ভগ্নদশার যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন শ্রমিকের সংলাপে-

> পেত্যেকবার সাইজ্যা-গুইজ্যা পান-বিরি খাইয়া ভোট দিবার গিয়া হুনি আমাগো ভোট হইয়া গেছে গা। আমরা জিগাই, ক্যামনে হইলো কে দিল আমাগো ভোট? জ্বীন-পরিয়ে নাহি? জব ত পাই-ই না! উল্টা লৌরানি দেয়।[১২৩]

বাংলাদেশের এই বিপন্ন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায়ও নাট্যকার আশার কথা শুনিয়েছেন-

> রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক কেউ কারো কাজ করছে না, বা করতে পারছে না বা করতে দেয়া হচ্ছে না। সঠিক কাজগুলো তাই একেবারেই হচ্ছে না। জায়গার লোক জায়গায় নেই। তাই কথার মতন কথাও নেই। ব্যতিক্রম শুধু এই ছাত্ররা। এদের মূল চরিত্র এখনও ঠিক আছে।[১২৪]

নাট্যকার বিধবা সাহানার প্রচণ্ড হতাশার মধ্য দিয়ে চরম একটি সত্য প্রকাশ করেছেন। এখন মুক্তিযোদ্ধা, তার স্ত্রী এসব বিষয়ে কারো যায় আসে না, কেউ মাথা ঘামায় না। অনেকে বরং এসব বিষয়কে ফালতু সেন্টিমেন্ট হিসেবে গণ্য করে। দৃঢ় মনোবলের অধিকারি সাহানা শেষ পর্যন্ত রহমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে কিন্তু

[১২২] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

[১২৩] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২

[১২৪] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

জয়ী হতে পারেনি। রহমতের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হুমকি ধমকি উপেক্ষা করেই নির্ভীক নারী মেয়েকে শোনায়-

> 'যাবার মতন এখনও অনেক জায়গা আছে' অথবা 'এখনো মানুষের মতন মানুষ আছে।' অর্থাৎ সাহানা বিশ্বাস করে, এখনো ভাল মানুষ দেশে আছে নইলে দেশটা চলত না।[১২৫]

কিন্তু কোথায়, কার কাছে যাবে সাহানা? থানায় গিয়ে সাহানা দেখেছে চোর বদমাশ, খুনি-হাইজ্যাকারদের ছাড়িয়ে নিতে নেতারা টেলিফোন করে। সেই থানায় সাহানা ন্যায়ের পক্ষে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা পাবে, তা আশা করা যায় না। ওসি কালীপদ ঘোষ সম্ভবত এজন্যই বলতে বাধ্য হয়- ''ফোনের পাওয়ার আমার ইউনিফর্মের চেয়ে বেশী। ইচ্ছে করে ফোনের তার ছিঁড়ে ফেলি।''[১২৬]

নিজের রুটি রুজির সংস্থান ও জীবিকার একমাত্র ভরসা চাকরিটা রক্ষার স্বার্থেই কালীপদ ঘোষ বিবেকের এই দংশন থাকা সত্ত্বেও টেলিফোনের তার ছিঁড়েও আবার জোড়া দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে রেজিস্ট্রি অফিসের চিত্র নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন, সেখানেও সাহানার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সাহানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু বর্তমানে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খবরের কাগজে একটুখানি বিবৃতি দেয়া ছাড়া কিছুই করার ক্ষমতা নেই। সেই বিবৃতিও ছাপা হয় না সময়মতো। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা শুধু মন্ত্রীই আছে মুক্তিযোদ্ধা নেই। শেষ পর্যন্ত সাহানা তার বসতভিটা রক্ষার প্রার্থনা নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কাছে যায়। স্বামীর সহযোদ্ধা ক্যাবিনেট মন্ত্রীও সাহানার বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেনি। কারণ, রহমত আলীদের দৌরাত্ম্য ক্যাবিনেট পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং নাট্যকাহিনীতে দেখা যাচ্ছে সাহানা তার প্রত্যাশিত ভালো মানুষের খোঁজে থানা থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রি অফিস,

---

[১২৫] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

[১২৬] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং স্বামীর সহযোদ্ধা মন্ত্রীর কাছে গিয়েও সেই ভালো মানুষের দেখা পায়নি।

কাহিনীর সংকট মোচনে নাট্যকার হাজির করেছেন আর. কে. চরিত্রটি। যুদ্ধের সময় আর. কে. পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মারুফের বাবার হাতে-পায়ে ধরে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। একদিন আর. কে. হঠাৎ এসে সাহানাদের বাড়িতে হাজির হয়। কুশল জিজ্ঞাসা করলে রুনু জানায় রাজাকার রহমত আলীর জবর দখল প্রক্রিয়া ও হুমকি ধমকির কথা। এজন্য রুনুকে সাহানা চড় মারে। মায়ের হাতে এক চড় খেয়ে রুনু মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী সাহানার অহঙ্কারের দর্পচূর্ণ করে দিয়ে বলে-

> ...তুমি কিচ্ছু পারো না! তুমি এ জায়গাটা বাঁচাতে পারো না। এ বাড়ীটা বাঁচাতে পারো না। কিন্তু ঐ রাজাকারটা পারে।[১২৭]

যে ভালো মানুষের আশায় সাহানা গর্ব করেছিল, সমাজে তাদের দেখা মেলেনি। থানা পুলিশ থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত দৌড়িয়েও সাহানা তাকে সাহায্য করার মতো কোনো ভালো মানুষের দেখা পায় নি। এরকম বাস্তবতায় আবদুল্লাহ আল-মামুন দেখিয়েছেন, রহমতের জবর-দখল প্রক্রিয়ার হাত থেকে রুনুদের বসত বাড়ি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু রহমত আলীকে ধরে এনে সাহানার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়ে রহমতকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে। সে আর কোনোদিন সাহানার বাড়ির দিকে নজর দেবে না। বলাবাহুল্য যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীর কাছে গিয়েও সাহানা প্রতিকার বা সাহায্য পায় নি; আর. কে সেই মন্ত্রীর মাধ্যমেই রহমত আলীর দৌরাত্ম্য রোধ করেছে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় আর. কে দের অর্থাৎ রাজাকারদের বর্তমানে ক্ষমতার উৎস একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাবিনেট মন্ত্রী। মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী সাহানা যখন সাহায্যের আর্জি নিয়ে গিয়েছিল, তখন মন্ত্রী সাহায্য করে নি। কিন্তু আর. কে. যখন সাহানার বসত বাড়ি রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রীকে, তখন বিলম্ব হয়নি।

---

[১২৭] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র', *দ্যাশের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের পরিণতি দৃশ্যে নাট্যকার পরিকল্পিতভাবে আর. কে. চরিত্রটিকে হত্যা করেছে। হত্যা করে নাট্যকার সমাজে-রাষ্ট্রে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির জয় দেখাতে চান। এজন্যই নাট্য পরিণতিতে সাহানার আহ্বানে নাটকের কোরাস দল সাধারণ জনতা সেজে গণপিটুনির মাধ্যমে আর. কে. চরিত্রটিকে হত্যা করেছে। আর. কে. এর মৃত্যুর পর সাহানা আগন্তুক জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে, এই স্বৈরাচারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের বাতাস বইতে শুরু করবে। কিন্তু দেশে ভণ্ড রাজনৈতিক নেতারা যতদিন থাকবে, ততদিন দেশে গণতন্ত্রের হাওয়া বইবে না। কারণ আমাদের রাজনীতিকরা নীতিতে নয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, এবং ক্ষমতার রাজনীতি করে। তবে নাট্যকার নাট্য পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের জয়গান সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

একটি মাত্র চরিত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করেছেন *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭) নাকটটি। মাইক মাস্টার হজরত আলী পিতা মৃত একাব্বর আলী মুন্সী। সে মুন্সী পদবিটা ত্যাগ করেছেন কারণ দেশে মোল্লামুন্সিদের যে অবস্থা তাতে সম্মান বাচবে না। হজরত আলী ১৯৪২ সালে মেট্রিক পাস করে ঠেলেঠুলে বি.এ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরপর থেকে রাজনীতি শুরু করে। তার রাজনীতির মূল বিন্দুতে ছিল দেশ এবং দেশের স্বাধীনতা। নিজের স্বার্থে তিনি রাজনীতিকে ব্যবহার করেননি। তাইতো তার জুনিয়র নেতারা আজ দেশের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছে আর সে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। আজ পয়ষট্টি বছর বয়সে হজরত আলী দায়িত্ব পেয়েছে মাইক মাস্টারের অর্থাৎ সে এখন রাজনৈতিক দলের কোন ঘোষণা থাকলে মাইকে প্রচার করার কাজ করে। যদিও তার নাতির বয়সী লোকেরা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হয়েছে। হযরত আলীর অবাক লাগে এদেশের জনগণের বোকামি দেখে। এদেশের জনগণ অনেকটা হুজুগে মাতাল। যখন যেখানে যে বক্তৃতা দেয় সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যায়। ইতিহাসের নব্য মীর জাফর, আজীবন সার্কাসের ক্লাউন, বেইমানটাও যখন কোঁকাতে কোঁকাতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ায় তখনও কমবেশি পাবলিক জুটে যায়। এদেশটাকে বিচিত্র রকমের দুর্ভগা বলে অভিহিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের কিছু বেঈমান স্বার্থপর মানুষের কথা নাট্যকার অবতারণা করেছেন। যারা স্বাধীনতার অব্যহতি পরে স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে দেশের পিতাকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না-

> স্বাধীন হবার উদগ্র বাসনায়, মুক্তির জন্যে তীব্র উন্মাদনায় নেতাকে পিতা বানায়। পিতার হাতে ধরিয়ে দেয় বিপজ্জনক পতাকা। পিতা সারি সারি কামান বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জীবন বাজি রেখে একদিন পিতা পুত্রকে এনে দেন মুক্তি, স্বাধীনতা। বিনিময়ে পুত্র সাজে জন্মদাতা পিতার কুৎসিত ঘাতক। পিতার রক্তে রঞ্জিত করে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি।[১২৮]

মাইক মাস্টার হজর আলী লক্ষ করেছেন এদেশের জনগণ হুজুগে মাতাল। তাদের বিবেক বুদ্ধি সবসময় ঠিকভাবে কাজ করেনি। রাজনৈতিক নেতা হবার ইচ্ছা সেদিনই তিনি ত্যাগ করেছিলেন যেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে হত্যা করার পরেও পিতার মৃত্যুর প্রতিবাদে জনসাধারণ প্রতিবাদের আগুনে ঝলসে উঠে না, নির্বিকার খায়, ঘুমায় আর সন্তান উৎপাদন করে। তাইতো এরকম অকৃতজ্ঞ বেঈমান বাঙালির প্রতি ক্ষোভের থেকে সে বলেছে রাজনীতি করবে না। তারপর সে রাজনৈতিক দলের অফিসে পড়ে আছে কেননা তারতো কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

স্বাধীনদেশে একজন রাজনৈতিক নেতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে দেখা যায় এসমস্ত রাজনৈতিক নেতারা দেশ পুনর্গঠিত না করে বরং ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার কাজে বেশি লেগে গেছে। এসব নাম সর্বস্ত পার্টির নেতাদের অন্যায়, কালোবাজারি মাইক মাস্টার হজরত আলী চায় দেশবাসিকে জানিয়ে দিতে। দেশপ্রেমের নামে দেশের নেতারা কী করছেন সে খবর আমজনতা জানুক সেকথা হজরত আলী সকলকে বলে দিতে চায়-

---

[১২৮] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্বাচিত নাটক', *মাইক মাস্টার*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ, ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

> তুমি এক সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টির ওয়ার্কার হয়ে গাড়ি হাঁকাও। বাড়ি হাঁকাও? সিঙ্গাপুরে বউ নিয়ে মার্কেটিংয়ে যাও? তোমার ছেলেকে আমেরিকায় পড়াও? সব ব্যাটার চাঁদাবাজি আর ডাণ্ডাবাজির খবর চোঙা ফুঁকে আমি দেশবাসীকে জানিয়ে দেবো।[১২৯]

স্বাধীনদেশে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে নির্যাতন তথা জুলুমের শিকার হতে হয় এমনকি সাক্ষী প্রমাণ না থাকার লক্ষ্যে অনেক সময় মেরেও ফেলা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে এটাইতো স্বাধীন দেশে একজন স্বাধীন নাগরিকের কাম্য হওয়া উচিত। আজও দেখা যায় রাজনৈতিক নেতাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে প্রাণ দিতে হয়। হজরত আলীর বাইশ বছরের যুবক নাতি গ্রামের চেয়ারম্যানের গম চুরির বিরুদ্ধে থানায় নালিশ দিলে চেয়ারম্যানের পেয়াদাদের লাঠির বাড়ি খেয়ে তাকে মরতে হয়েছে। হজরত আলীর মাধ্যমে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনার স্পষ্ট অবস্থান টের পাওয়া যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে বাংলার বঙ্গবন্ধু, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমম্বা, চিলির আলেন্দে, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যাণ্ডেলা ও যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকনের মতো দেশপ্রেমিক নেতার প্রত্যাশা কামনা করেন। এমন দেশপ্রেমিক নেতা থাকলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে। নেতারা যদি স্বার্থপর হয়ে যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন কীভাবে হবে? *মাইক মাস্টার* নাটকের যবনিকায় নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জাগ্রত হবার মানসে আহবান করেছেন-

> প্রেম বিনা বাঙালির মুক্তি নেই। একমাত্র প্রেমের শক্তিতেই অতিক্রান্ত হোক সকল দুর্ভাগ্য, দুর্নীতি, অসত্য, সন্ত্রাস। প্রেমের শক্তিতেই বাঙালির হৃদয়ের আসনে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হোক জাতির পিতা, একজন বঙ্গবন্ধু, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন শহিদ জননী এবং–এবং একজন মরহুম হজরত আলী, পিতা মৃত একাব্বর আলী মুন্সি, গ্রাম-বাংলাদেশ, পোস্টঅফিস-বাংলাদেশ, জেলা বাংলাদেশ, দেশ বাংলাদেশ।[১৩০]

---

[১২৯] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *মাইক মাস্টার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

[১৩০] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *মাইক মাস্টার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

Dhaka University Institutional Repository

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে, যে যেভাবে পারে সেভাবে দেশটাকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেছে। জাতির পিতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়নি, তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শ বলতে কিছুই ছিল না, তারা রাজনীতি করেছে মূলত সম্পদের পাহাড় গড়তে। তারা যখন খুশি সুবিধামতো দল বদলায়। যেখানে স্বার্থের সম্ভাবনা বেশি সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এ সমস্ত ভণ্ড নেতাদের মধ্যে যে দেশ প্রেম ছিল না সে কথাই নাট্যকার একক চরিত্র বিশিষ্ট নাটক *মাইক মাস্টার* এ বলার চেষ্টা করেছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব দেখে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সমকাল সচেতন, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন রচনা করেছিলেন মাইক মাস্টার নাটকটি। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতিবিদদের প্রতি নাট্যকারের সমালোচনা কাল্পনিক কোন বিষয় নয়; যা বাস্তব পরিস্থির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে '৭১ এর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা কীভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে কীভাবে ব্যবহার করছে সেসব দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে *মেহেরজান আরেকবার* (১৯৯৮) নাটকে। নাটকের মূল চরিত্র মেহেরজান। সে কাজ করে সোনার বাংলা নামক একটা হোটেলে। তার সঙ্গে আছে মেয়ে পরী, পুত্রবধু বিধবা সখিনা। একজন মুক্তিযোদ্ধা শিকদার যিনি ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু নিয়তির পরিহাসে আজ ট্রাক ড্রাইভার। স্বাধীন দেশে শিকদার চায় স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম করতে। কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা তা দিতে চায় না। বিশেষ করে, বদরবাহিনীর নেতা হাজীর মতো লোকেরা। শিকদার যদিও হাজীর ট্রাকের ড্রাইভার তার পরেও সে চায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে। স্বাধীনদেশে কেউ কারো গোলাম হিসেবে কাজ করবে না। মুক্তিযোদ্ধা শিকদার বলতে চায় হরমুজ, মেহেরজান, পরী, সখিনা সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করবে কেউ কারো গোলামী করবে না। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় হাজী। শিকদার এর প্রতিবাদ করেছে। বদর বাহিনীর নেতা হাজীর মুখে থাপ্পর

Dhaka University Institutional Repository

দেয় মুক্তিযোদ্ধা শিকদার। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব তথা স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। একজন মুক্তিযোদ্ধা গরীব হলেও ভীরু নয় যা হাজী বুঝতে পারেনি-

> শিকদার : হরমুজ আলী, তুই সাক্ষী। আমি হাজীর দাড়িসমেত গালে থাপ্পর দিছি। দেখিস কথা জানি না উল্টাইতে পারে।[১৩১]

একজন মুক্তিযোদ্ধা কোন অন্যায় মাথা পেতে নিবে না। যাদের শত্রুতার কারণে '৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত নেওয়া হয়েছিল সেই শত্রুরা স্বাধীন বাংলাদেশে নেতৃত্ব দেবে, মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করবে তা মেনে নেয়া যায় না। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। একাত্তর সালে ভারতীয়রা সাহায্য করেছিল বলে বদর বাহিনীর লোকেরা ভারতীয়দের সহ্য করতে পারত না। ভারতীয় কানুর প্রশ্ন হাজী কেমন করে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে এখনো বেঁচে আছে। সে বিস্মিত হয়েছে এই ভেবে যে, স্বাধীনতার শত্রুরা কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে অবাধে বিচরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করছে।

মেহেরজান আরেকবার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেহেরজান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়িয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারেনি। ফতোয়ার শিকার হয়েছে। গ্রাম থেকে উৎখাত করা হয়েছে। নতুন জায়গায় নতুনভাবে চেষ্টা করেছে বেঁচে থাকতে। কিন্তু একসময় প্রবল বন্যায় ভেসে গেল মেহেরজানের ভিটা মাটি। স্বাধীনদেশে আবার উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিলেন সোনার বাংলা হোটেলে। এখন সেই সোনার বাংলা হোটেলও হাজীদের রোষানল থেকে রক্ষা পায় না। সখিনা ও পরীকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়। মেহেরজান সাহসিকতার সাথে তা মোকাবেলা করে। স্বাধীনদেশে একজন নারী স্বাধীনভাবে বসবাস করবে এটাই সবার কাম্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির নতুন করে অত্যাচারের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী

---

[১৩১] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *মেহেরজান আরেকবার*, (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

করতে বিন্দুমাত্র বিবেক বোধ কাজ করেনি। তরুণ প্রজন্ম হাজীদের হাতের পুতুল হলেও পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছে এরা স্বাধীনতার শত্রু ছিল। এমনই এক তরুণ হিটলার যে হাজীর দলে কাজ করে এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে-

> হিটলার : বহুতদিন ঐ বজ্জাতের গোলামি করছি। অর হুকুম্নে যখন তখন সন্ত্রাসী চালাইছি। যেইখানে সেইখানে বন্দুকবাজী, বোমাবাজী করছি। আর না।[১৩২]

স্বাধীনদেশে হাজীর মতো যুদ্ধাপরাধীরা মৌলবাদের উত্থান করেছে। তাইতো হাজী সোনার বাংলা হোটেলের নাম দিতে চায় কোন একটা ইসলামী নামে। শিকদার হাজীকে বলেছে, সে টুপি পিন্দা, তসবি টিপা, মসজিদের ভিতরে দল পাকাইয়া আর বেশিদূর যাইতে পারব না। দেশের মানুষ অনেক সহ্য করেছে আর করবে না। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে হাজী গুলি করে মেরে ফেলে। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন যেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিদের অপতৎপরতা রোধে উদ্বুদ্ধ এক সজাগ প্রহরী। মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ পরিণতি সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রচার করে তাদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল যে গোষ্ঠী তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে আমরা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জয় ঘোষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সৈনিক নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন যিনি চেয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকুক। সেই সঙ্গে এদেশের নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করুক। কেউ কারো দ্বারা প্রতারিত, অত্যাচারিত,ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। যেসমস্ত তরুণ প্রজন্ম ইতোমধ্যে বিপথগামী হয়েছিল তাদের অনেকেই ভুল বুঝতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যে তরুণরা আগামীদিনের ভরসার স্থল। যাদের নেতৃত্বে চলবে আগামীর সুন্দর দেশ তারাই যদি ভুল পথে চলে তাহলে কীভাবে দেশের অগ্রগতি হবে। তাইতো বিপথগামী তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে নাট্যকার *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেহেরজানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-

---

[১৩২] 'নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন', *মেহেরজান আরেকবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

Dhaka University Institutional Repository

> হাজীবাবা হাজীবাবা করস? স্বাধীন দেশে বদর–বাহিনীর জানোয়ারের পাও চাটস? এইনি এই দেশের তোরা ভরসা? কোনো দরকার নাই। তরা পইচ্যা গ্যাছস। বাঁইচ্যা থাকলে তরা পুরা দ্যাশ পচাইবি। কোনো দরকার নাই।[১৩৩]

স্বাধীনতা বন্দি রয়েছে কতিপয় অসৎ লোকের হাতে। যেখানে মুক্তিযোদ্ধা শিকদারকে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল-বদর হাজী'র ট্রাক চালিয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। নিরীহ হোটেল ব্যবসায়ী হরমুজ, হোটেলের নারী কর্মী মেহেরজান, সখিনা, পরী এরা সবাই যেন ওদের হাতে বন্দি। নাটকের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার শত্রু হাজী, মেহেরজানের হাতে থাকা স্টেনগানের গুলিতে মারা যায়। যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিজয়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা বিরোধীরা বিপথগামী করার চেষ্টা করে কিছুটা সফল হলেও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে এদেরকে সুপথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস প্রচার না হলে এদেশ আবার পুরনো শত্রুদের কব্জায় চলে যেতে পারে এ বিশ্বাস নাট্যকার হৃদয়ে ধারণ করেই রচনা করেছেন *মেহেরজান আরেকবার* নাটক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধের প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন এনেছে নতুন মাত্রা তেমনি বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সুদূর প্রসারি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাহিত্যধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছে নাট্যসাহিত্যে। আর এ ধারার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন। স্বাধীনতা উত্তরকালে যুবসমাজের হতাশা ও বিপথগামিতা তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে, বিপথেচালিত এই যুবসমাজকে কীভাবে সুপথে এনে তাদের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করা যায় সে লক্ষ্যে কলম ধরেছেন তিনি। আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটকে বারবার মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মমর্যাদার দিকটি উন্মোচন করেছেন। সুযোগ সন্ধানি দেশের শত্রুরা অবস্থাবুঝে ক্ষমতাসিন দলের সাথে মিশে গেছে ঘনিষ্ঠভাবে। এসব নেতারা দেশের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে

[১৩৩] 'আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্বাচিত নাটক', *মেহেরজান আরেকবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তাদেরকে বিপথগামী করছে। স্বাধীনদেশে পুরাতন শত্রুরা আবার মাথা উচু করে দাঁড়ালে আসল মুক্তিযোদ্ধারা পদে পদে লাঞ্ছিত হবে এ বিষয়টি নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন মেনে নিতে পারেননি। ছদ্মবেশী এসব শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আবদুল্লাহ আল-মামুন কেবল স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যান্দোলন সম্পৃক্ত সৃষ্টি উন্মাদনা ও সিদ্ধির স্থপতিই নন, তিনি স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পস্নিগ্ধ প্রাণস্পর্শী বহু নন্দিত নাটকের প্রযোজক এবং আজকের খ্যাতিমান অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক ও নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষকও। স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যধারায় জীবনঘনিষ্ঠ সমকালস্পর্শী মঞ্চসফল নাট্যকার হিসেবে আবদুল্লাহ আল-মামুনের সৃষ্টি প্রাচুর্য ও জনপ্রিয়তা রীতিমতো প্রশংসনীয়। তাঁর জনপ্রিয়তা কেবল মনোরঞ্জক উপাদানের জন্য আসেনি এসেছে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের আলোড়ন, ন্যায়-নীতি-অবক্ষয় ও দুঃসহ পরিস্থিতির রূপায়ণের জন্য।

মুনীর চৌধুরীর মতো শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ আবদুল্লাহ আল-মামুনের জীবনের মোড়কে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে, তাঁকে রূপান্তরিত করেছে এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান সব্যসাচী লেখক ও নাট্যকার হিসেবে। মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে অভিনয়, নির্দেশনা, নাট্যরচনা, চিত্রনাট্য রচনা, টিভি নাটক রচনা, বেতার নাটক রচনা ও প্রযোজনার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন এবং সফল হয়েছেন। স্বাধীনতা–উত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছে নাট্যসাহিত্যে। মুক্তিযুদ্ধের শাণিত চেতনা, পুরানো ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে হটিয়ে দিয়ে নতুন নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি ও প্রেরণা ছড়িয়ে পরেছে নাট্যসাহিত্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধ সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে যেমন নিয়ে এসেছে নতুন নতুন চেতনা, মূল্যবোধ, প্রেরণা, আঙ্গিক ও শৈলী তেমনি আমাদের '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে এসেছে নতুন জোয়ার, নতুন ধ্যান-ধারণা, নতুন নতুন ধারা ও শৈলী। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষের আশা-আনন্দ, সুখ-দুঃখ, হতাশা, বঞ্চনা, আনন্দ আর উল্লাসকে ঘিরে রচিত হলো নাটক। সময়ের দাবি মেটাতে নাটক রচনায় এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। সহজ, সরল,

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট এবং সরাসরি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সময়কে উপস্থাপন করলেন তাঁর অসংখ্য নাটকের মাধ্যমে।

প্রবল আবেগ এবং তীব্র নাটকীয়তা নিয়ে লিখেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি বাংলাদেশের নাট্যজগৎকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তিনি শক্তিশালী নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, নাট্য নির্দেশক, নাট্যপ্রযোজক, নাট্যপ্রশিক্ষক ও নাট্যদল সংগঠক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, দেশপ্রেম সহ একাধিক বিষয় তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। থিয়েটার স্কুলের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নাটক লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, নিদের্শনা দিয়েছেন, অভিনয় করার উপর বই লিখেছেন, নাট্যবিষয়ক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রেখেছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে আমরা লক্ষ করি, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নানা আলোড়ন, বিলোড়ন, মূল্যবোধহীনতা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি ও উত্তরণের আহ্বান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ বাস্তবতাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে, আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাট্যভুবন। এ ধারায় তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫), *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *সেনাপতি* (১৯৮০), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *এখন ও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), *তোমরাই* (১৯৮৮), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩), *মেহেরজান আরেকবার* (১৯৯৮), *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭), *বিবিসাব* (১৯৯১), *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮) ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে অতি দ্রুত আমাদের সমাজ থেকে সুবচন, শুভবুদ্ধি কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সেসব বিষয় নিয়ে শিল্পিত হয়েছে, *সুবচন নির্বাসনে* নাটক। *তোমরাই*, *এবার ধরাদাও* এবং *আয়নায় বন্ধুরমুখ* নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে যুবসমাজের হতাশা, বিপথগামিতা এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তরুণ সমাজের যে অবক্ষয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান ঘুরে ফিরে এসেছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের রচনায়। *এখন ও ক্রীতদাস*, নাটকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। নাগরিকের জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্যের পাশাপাশি বস্তিজীবনের দুর্বিষহ বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে এ নাটকে। আমাদের সমাজকে কেউ না কেউ ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। ক্রীতদাস বানানো শোষকশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এ নাটকে। তাঁর নাটক আমাদের উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, আমাদের স্বপ্ন দেখায় অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের, স্বাধীনতা উত্তরকালে যুবসমাজের হতাশা, বিপথগামীতা, আত্মসমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাটকে। *আয়নায় বন্ধুরমুখ* নাটকে রানার স্বীকারোক্তিতে পাপের পথ থেকে সুন্দর জীবনে ফিরে আসার ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। *এবার ধরা দাও* নাটকে করজোড়ে আত্মগ্লানি ও পরিশুদ্ধির বোধ থেকে তরুণকে বলতে শুনি আমি ভালো থাকতে চাই আমাকে বাঁচান। আপনাদের পরবর্তী জেনারেশনকে একটি সৎ পরামর্শ দিয়ে ধবংসের মুখ থেকে রক্ষা করুন। *এখন দুঃসময়* নাটকে সোনাচরিত্রের মাধ্যমে মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া বেপারি ও টাউট মুন্সীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। *সেনাপতি* নাটকে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তালুকদার রূপি ছদ্মবেশি চরিত্রের কারণে দেশের উন্নয়নে কীভাবে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এদের চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করে প্রতিহত করার আহ্বান করেছেন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন।

তোমরাই নাটকে রাজাকার হায়দার আলী মুক্তিযোদ্ধা ননী ব্যানার্জিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে নতুন প্রজন্ম, তাদের কথা মতো চলবে। কিন্তু নাটকের শেষে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের রঞ্জু বিপথগামী হলেও অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়ই শাণিত হয়েছে। তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার পতাকা। *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের শেষাংশে দেখা যায় স্বাধীনতার শত্রু হাজী মেহেরজানের হাতে থাকা স্টেনগানের গুলিতে নিহত হয়। যা স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিজয়। *মাইক মাস্টার* নাটকে দেখতে পাই, যে পিতা জাতির মুক্তি এনে দিয়েছে তাকেও হত্যা করতে পরোয়া করেনি এদেশের জঘন্য সন্তানেরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশকে অস্থির করে স্বাধীনতার শত্রুদের রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ ছিল দিবালোকের মতো সত্য। নাট্যকার এসব স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের ধিক্কার জানিয়েছে *মাইক মাস্টার* নাটকে। *বিবিসাব* নাটকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাজাকার-আলবদর বাহিনীর মতো জঘন্য ঘৃণ্য সদস্যদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু সুবিধাবাদি মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা মেম্বার যিনি হাত মিলিয়েছেন '৭১ এর রাজাকার বসিরুদ্দিন মোল্লার সাথে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান কেবল অনুষ্ঠান মঞ্চে হাত তালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে *তৃতীয় পুরুষ* নাটকে। লায়লার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহিদ জাফর, নাটকের শেষে স্বাধীনতার শত্রু আলী ইমামের স্বীকারোক্তি জাফরের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি, এদেশ জাফরের ইমামের নয়, এ কথার মাধ্যমে নাট্যকারের, মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি আনুগত্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য দেশের শত্রুদের সাথে একই ছাতার নিচে দাঁড়াতে লজ্জা পায়নি ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা। এরকম বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক *দ্যাশের মানুষ*। নাটকের শেষে আর. কে. চরিত্রকে হত্যার মাধ্যমে নাট্যকার স্বাধীনদেশে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জয় দেখিয়েছেন।

সদ্য স্বাধীনদেশে নতুন প্রজন্মকে বিপথগামী করতে স্বাধীনতার শত্রুরা নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষার জন্য যে'কজন নাট্যকার সফল হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবদুল্লাহ আল-মামুন। স্বাধীন দেশে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিরোধীরা সফল হলেও আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে মুক্তিযোদ্ধাদের জয় দেখিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস সাহসিকতার সাথে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাইতো তাঁর মুক্তিযুদ্ধের নাটক সমূহ হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের আবেগে শাণিত। যেখানে আমরা খুঁজে পাই একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুনকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ :

নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল-মামুন (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), নালন্দা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটক সমগ্র-১, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

আবদুল্লাহ আল-মামুন : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক সমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৩

চারদিকে যুদ্ধ, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

অরক্ষিত মতিঝিল, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

এবার ধরা দাও, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

সেনাপতি, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

এখন দুঃসময়, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

কোকিলারা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

তৃতীয় পুরুষ, কথন প্রকাশনী, ৩৬ নারিন্দা রোড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৫

তিনটি পথ নাটক (বিবিসাব), ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

অভিনয়, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

খ. সহায়ক গ্রন্থাবলি :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৯-২০০০

অজিতকুমার ঘোষ : *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৩৯৭

: *নাটকের কথা*, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ১৯৮৬

: *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, পঞ্চম সংস্করণ, জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭০

অমৃতলাল বালা ও ঊষা রাণী সরকার (সম্পা.) : *শচীনন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত: সিরাজউদ্দৌলা*, সাহিত্য বিলাস, বইমেলা-২০১২

আনোয়ার পাশা : *সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭

আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, ১৯৭১

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *শাহাদাৎ হোসেন জীবনী গ্রন্থমালা-৩*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *শিল্পীর সাধনা*, তৃতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৫

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬১

ইসমাইল মোহাম্মাদ : *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার : *সাহিত্যের রূপ-রীতি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫

একেএম খায়রুল আলম : *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯০

কবীর চৌধুরী : *প্রসঙ্গ নাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

: *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

: *মুনীর চৌধুরী, জীবনী গ্রন্থমালা-১০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

: *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, বইমেলা ২০০১

কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য : *বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ*, নবগ্রন্থ কুটির, কোলকাতা, ১৯৮৮

জিয়া হায়দার : *নাট্য ও নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

তপন ঘোষাল : *একাঙ্ক নাটক প্রয়োগ ও বিচার*, নবগ্রন্থ কুটির, কোলকাতা, ১৯৮৯

দবিরুদ্দিন আহমেদ : *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ*, খুলনা, ১৯৮৪

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *নাট্যচিন্তা ও শিল্পজিজ্ঞাসা*, ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট, কোলকাতা, ১৯৭৮

দীপক চন্দ্র : *বাংলা নাটক আধুনিকতা ও গণচেতনা*, সাহিত্য সংস্থা, কোলকাতা, ১৯৮২

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ১৩৯১

নীলিমা ইব্রাহিম : *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

নুরুল মোমেন : *নেমেসিস*, কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫

বাংলা সাহিত্যকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

বশীর আল হেলাল : *ইবরাহীম খাঁ, জীবনী গ্রন্থমালা*-১৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা* (১৯৭১-৯৫), ঢাকা

: *বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

: *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রথম আজকাল সংস্করণ: ঢাকা , বইমেলা-২০০৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩৬৮

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ : *আকবরউদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-৪*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা , ১৯৮৭

মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী : *জসীম উদ্‌দীন, জীবনীগ্রন্থমালা-১৫*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা , ১৯৯৭

মুহম্মদ মজিরউদ্দিন : *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স নওগাঁ, রাজশাহী, ১৯৭০

রাজীব হুমায়ুন : *নাটক রচনা : রূপ ও রীতি*, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

রামেন্দু মজুমদার : *স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাটক : নাট্যান্দোলন*, থিয়েটার, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬

রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত) : *আবদুল্লাহ আল-মামুন সৃজনে ও মননে* : নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০১১

রাহমান চৌধুরী : *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শ্রীসুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(তৃতীয় খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৬

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ (সম্পাদিত) : *ফর্‌রুখ আহ্মদ ব্যক্তি ও কবি* , ইফাবা প্রকাশনা : ১৪২/২, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯০

সত্যজিৎ রায় : *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৬

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০০

সাধন কুমার ভট্টাচার্য : *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, দ্বিতীয় প্রকাশ, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৭৮

: *নাটক লেখার মূলসূত্র*, পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৮০

সাইফুল ইসলাম : *রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০০৩

সেলিম মোজাহার : *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

সেলিম আল দীন : *কিত্তনখোলা*, *তিনটি মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

সুকুমার বিশ্বাস : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

সৈয়দ অবুল মকসুদ : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, তাম্রলিপি, পুনর্লিখিত-পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০

সৈয়দ আকরম হোসেন : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, *জীবনী গ্রন্থমালা*-১৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

: *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থাবলি :

Bernard Shaw : *Plays Pleasant*, England, penguin Books Reprinted 1988

Benerji, B. : *Bengali Stage*, Calcutta 1943

DasGup: a, H. : *He Indian Stage*, Vols. 1 & 2, Calcutta, 1938

Edward Albert : *History of English Literature*, Fifth edition, Oxford University Press Calcutta, 1979

Edward J. Gordon : *English Literature*, Boston, 1964

Edward J. Gordon : *Types of Literature*, Boston, 1964

Edwin Wilson : *The Theatre Experience*, Megraw-Hill Book Company, 1985

William Shakespeare : *The Complete works of William Shakespeare*

Illust rated, New York, Avenel Books

Edwin Wilson : *The Theatre Experience*, Megraw-Hill Book Company, 1985

Robert Cohen : *Theatre*, Mayfield Publishing Company, 1981

Lagos Egri : *The art of dramatic Writing*, The Writer, Inc.Boston, 1960

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সহায়ক পত্রিকা :

থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৫তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৬, বনানী, ঢাকা

থিয়েটার (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), আবদুল্লাহ আল-মামুন স্মারক গ্রন্থ, ডিসেম্বর ২০০৮, বনানী ঢাকা

থিয়েটার (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), আবদুল্লাহ আল মামুন সৃজনে ও মননে, ২৭ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা-১০০০

থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৮তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, বনানী, ঢাকা

থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৩৯তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১০, বনানী, ঢাকা

থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), ৪৪তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫, বনানী, ঢাকা

ভাষা-সাহিত্যপত্র (সম্পাদক : অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কাহালি) ৪১তম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫, ঢাকা

থিয়েটার (সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার), আবদুল্লাহ আল-মামুন : ফিরে দেখা, ১৪৪ নিউ বেইলী রোড, ২০০৮, ঢাকা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (সম্পাদক : সৈয়দ আজিজুল হক), উনচল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন ২০২১, ঢাকা

Journal of Arts : Volume-10, Number-1, Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka, 2021